নতুন

নভেম্বর

সন্দেশ

ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

২০০৩

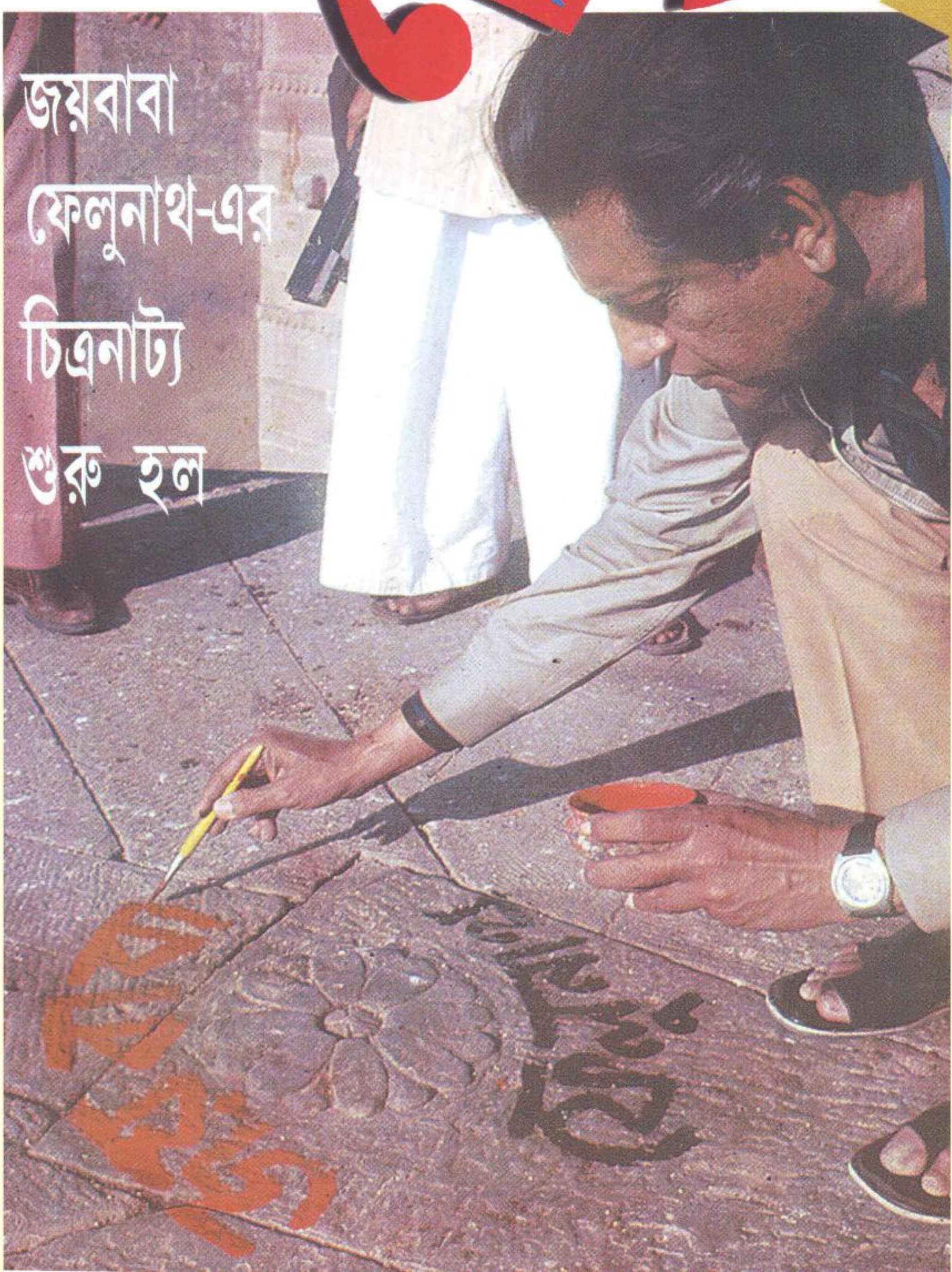

জয়বাবা ফেলুনাথ-এর চিত্রনাট্য শুরু হল

Hard Copy, Scan & Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

চিরকালের সেরা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

ছড়া কবিতা
জীবজন্তুর কথা
গল্প
বড়ো গল্প ও উপন্যাস
বনজঙ্গলের গল্প
পুরানের গল্প
নানারকম লেখা

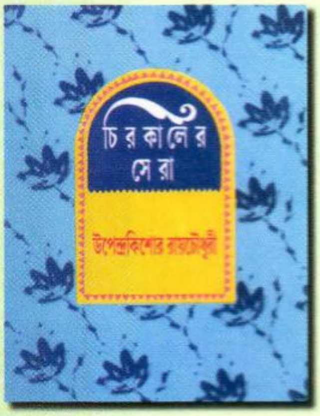

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

টুনটুনির বই
আরও গল্প
পুরানের গল্প
মহাভারতের গল্প
কবিতা ও গান
নানারকম লেখা

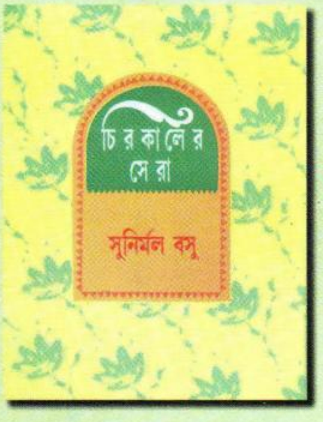

সুনির্মল বসু

ছড়া, কবিতা
রূপকথা
গল্প
নাটক
উপন্যাস

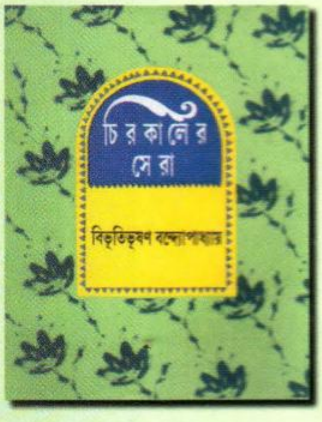

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার লেখা
গল্প
উপন্যাস
অরণ্য ও প্রকৃতি
ভ্রমণ

সুকুমার রায়

আবোল তাবোল
খাই খাই
অন্যান্য কবিতা
বহুরূপী, হ য ব র ল
পাগলা দাশু
বিদেশি গল্প
অন্যান্য গল্প
জীবজন্তু, জীবনী
অন্যান্য প্রবন্ধ, নাটক

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড

৩২এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ফোন - ২৩৫০ ৭৬৬৯, ২৩৫০ ৩১৯৫

ফ্যাক্স - +৯১ ৩৩ ২৩৬০ ৩৫০৮

নয়া চেহারার

সন্দেশ

নভেম্বরেও জমজমাট!

জয় বাবা ফেলুনাথ

ছবির ধারাবাহিক চিত্রনাট্য শুরু—

সঙ্গে এন্তার রঙিন

ও সাদা-কালো ছবি!

এছাড়া

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা

সে ছবির

না-দেখা

টাইটেল কার্ড!

সন্দেশ

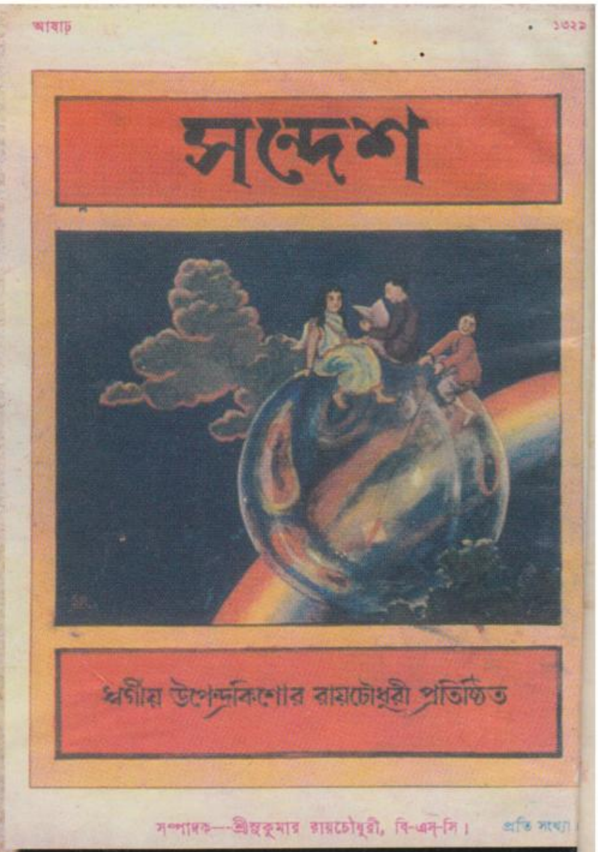
আষাঢ়
১৩২৯
সন্দেশ
স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত
সম্পাদক—শ্রীসুকুমার রায়চৌধুরী, বি-এস্‌-সি।
প্রতি সংখ্যা

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত
সন্দেশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৪০
JATIN SAHA
বার্ষিক
প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

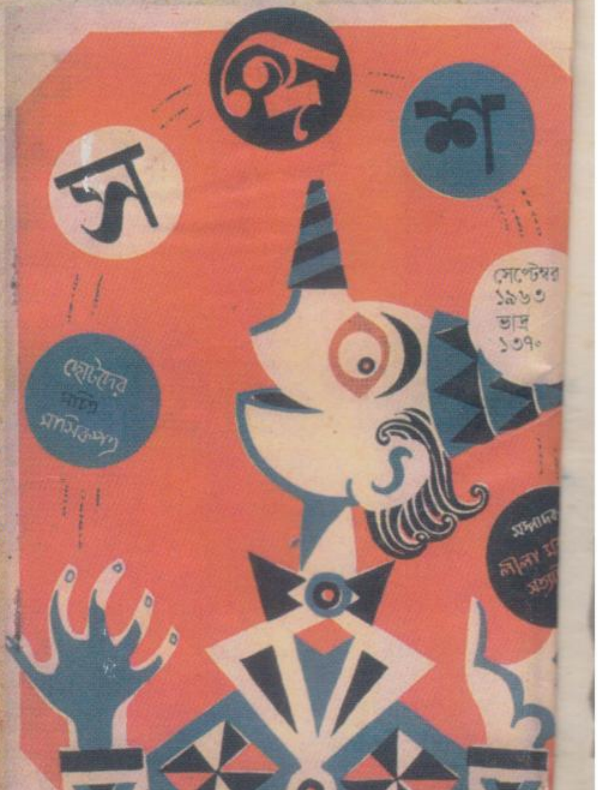
স
ন্দে
শ
সেপ্টেম্বর
১৯৬৩
ভাদ্র
১৩৭০
ছোটদের
মাসিকপত্র

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

ছোটদের সেরা মাসিক পত্র

সন্দেশ

তৃতীয় পর্যায় বর্ষ ৪২ কার্তিক ১৪১০

বিশেষ আকর্ষণ

চিত্রনাট্য : জয়বাবা ফেলুনাথ ৪১

পুরোনো সন্দেশ থেকে

রাজা গপ্পিদাসের গল্প : সুবিনয় রায় ২২

ধারাবাহিক উপন্যাস

যমুনাবতী : রাজা রায় ৫৬

গল্প

তিন দাদুর বৃন্দাবন যাত্রা : হীরেন চট্টোপাধ্যায় ৪

সমুদ্র-দ্বীপে সূর্যগ্রহণ : বলরাম বসাক ১১

আনন্দমেলা : লায়লী দাশ ২৪

কবিতা

তালকানা : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৩

রেল-মার্জার চক্রবল্টু কথা : প্রণব মুখোপাধ্যায় ১৮

কেন যে খুকুর মুখখানা ভারী : অশোক সী ১৯

ভেলকি : সিদ্ধার্থ সিংহ ১৯

রাবণ যখন ছোট্ট খোকা : চন্দ্রা মজুমদার ১৯

প্রবন্ধ

বিজ্ঞানীদের জীবনপাতা থেকে : অমরনাথ রায় ৩৫

বানররাও এখন ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ দিচ্ছে : বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৬৯

খেলা

গ্রেগ, মারাদোনা, পেলেরা : জয়ন্ত চক্রবর্তী ৬৪

স্বপ্ন আঁকল ইস্টবেঙ্গল : বল বয় ৬৬

কমিক্স

কমান্ডার বোস গৌতম কর্মকার ৩১

নন্দগুপীর মন্দ কপাল দিলীপ দাস ৫৪

কার্টুন

রাজা-রাজড়ার গল্প সর্বজিৎ সেন ১৭

বিভাগীয়

পাঁচ কথার প্যাঁচ শুভেন্দু দাশমুন্সি ২০

অঙ্কের মজা স্বপ্নাভ রায়চৌধুরী ৪৯

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর জীবন সর্দার ৫০

জানো কি? ৫২

গল্পসল্প রেবন্ত গোস্বামী ৬১

ধাঁধা ৬২

হাত পাকাবার আসর ৩৮

লেখা ও ছবি সৌমিক সরকার, রিখিয়া ভুক্ত,
সন্দীপন পারেখ, নবীনা রায়

সম্পাদক
সন্দীপ রায়

যুগ্ম সম্পাদক
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসাদরঞ্জন রায়

সম্পাদনা সহযোগিতা
সুমিতা সামন্ত

শিল্প নির্দেশনা
শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

বিশেষ সহায়তায় দেবাশিস সেন

সন্দেশ কার্যালয় ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলকাতা ৭০০ ০২৯ থেকে
প্রকাশিত এবং এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
২৯৪/২/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড (ফেডারেশন হল তৃতীয় তল)
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

স্বত্বাধিকারী সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড
e-mail sandesh@onlysmart.com

জয়বাবা ফেলুনাথ-এর অব্যবহৃত টাইটেল কার্ড

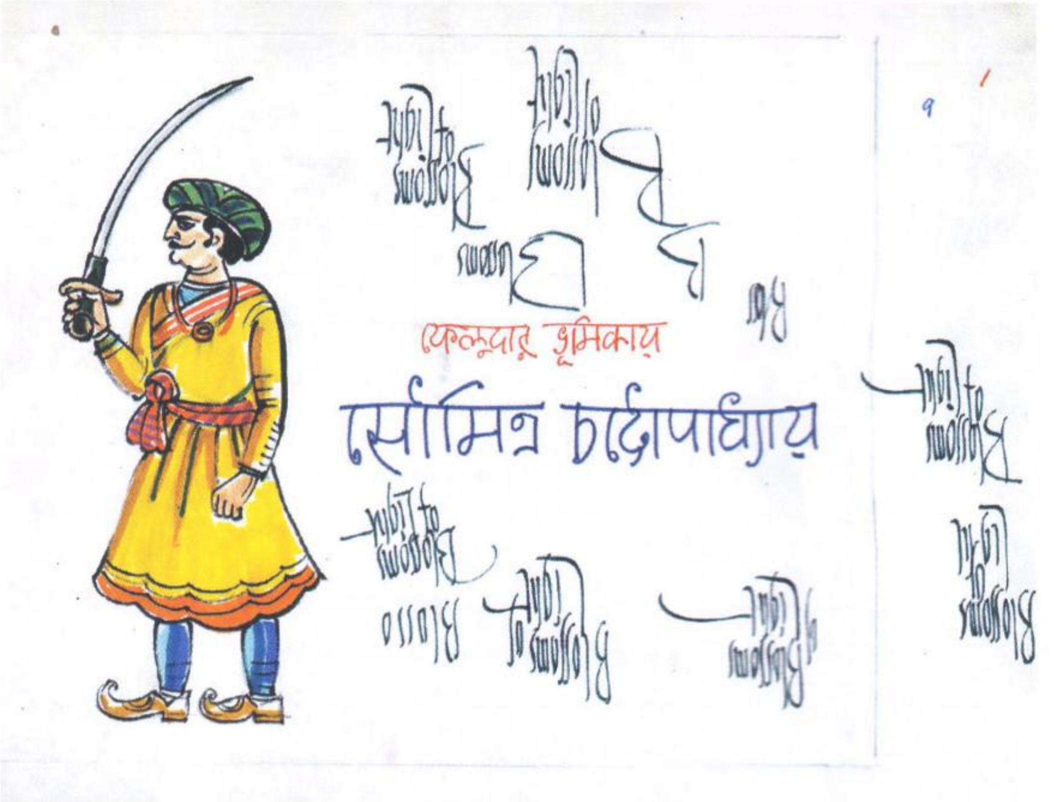

তালকানা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এক্ষুনি যেই নাচ জুড়ে দিল
কাঠবেড়ালি
তখনও কি তুমি গালে হাত দিয়ে
ভাববে খালি?

কাঠবেড়ালির চরণে ঘুঙুর,
সে যেই নাচে
হাসির বন্যা আরম্ভ হয়
শিরীষ গাছে;

ভিখিরির দল নামে কীর্তনে
বৈতালিকে,
কপট কলহ বাধে হরিণে ও
গাং-শালিখে।

গালে হাত দিয়ে তবু তুমি কেন
বাঁকাও ভুরু?
দেখে মনে হয় এই হবে বুঝি
প্রলয় শুরু!

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

তিন দাদুর বৃন্দাবন যাত্রা

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ননীলের বিখ্যাত তিন দাদুকে চেনে না, এমন মানুষ উত্তরপাড়ায় খুঁজে পাওয়া শক্ত। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই রোদ নেই বৃষ্টি নেই— বিকেলটি হল কী তিন ঢগঢগে বুড়ো সাজুগুজু সেরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। যাবে না বেশি দূর। এই এধার-ওধার একটু ঘোরা, কোথায় কোন পুকুর বুজিয়ে বাড়ি উঠছে সেটা দেখা। খাবে না— তবু পুরোনো তেলেভাজার দোকানের সামনে এসে একটু গালগল্প করা, আর সবশেষে পুরোনো লাইব্রেরি-ঘরের বারান্দায় এসে আসর জমানো। এ একেবারে নিত্যি দিনের অভ্যেস।

তিন দাদু বলে শুধু নয়, স্বপ্ননীলদের বাড়িটাই যেন উত্তরপাড়ায় একটা দর্শনীয় স্থান। তিন দাদু, অর্থাৎ কিনা তিন ভাই তো আছেই— একদা জাঁদরেল ডাকসাইটে মানুষ। দুই ভাই কাজ করতো জাহাজ কোম্পানিতে, আর এক ভাই টি-বোর্ডে। নিজেরা কোনোদিন ছাড়াছাড়ি হবে না, ছেলে-মেয়েদেরও বাড়ি ছেড়ে দূরে যেতে দেবে না, এই ছিল তাদের জীবনের ব্রত। স্বপ্ননীলের বাবা জ্যাঠারা মাঝে মাঝেই ঢেউ তুলেছে বাইরে যাবার— বাইরে না গেলে উন্নতি হয় না, প্রোমোশন পাওয়া যায় না, চারদিকে কী হচ্ছে ভালো করে দেখা যায় না, শেখা যায় না। বুড়োদের এক কথা, দেখ না বাবা যত দেখবি, যেখানে খুশি যা, কিন্তু ফিরতে হবে এই বাপ-ঠাকুর্দার বাড়িতে। বাড়ি থেকে একটা ছেলে গিয়েছিল জার্মানি, আর একজন লন্ডন। ঠিক আছে, যাও যেখানে খুশি, পড়াশুনো করো যা করতে চাও, তারপর বাপু ঘরের ছেলে ঘরে ফেরো। তোমাদের নিয়ে ঘর-সংসার করব বলেই তো তোমাদের মানুষ করা, না কী! মোট কথা স্বপ্ননীলদের পুরনো দোতলা বাড়িতে ভুল করে একদিন ঢুকে পড়লেই মনে হবে যেন কোনো যজ্ঞি বাড়িতে এসে পড়েছি। লোকে লোকারণ্য, এ দিকে ছুটছে, ও ওদিকে যাচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যেও আসল ব্যাপারটা খেয়াল আছে সকলের, সেদিকে ভুল হবার জো নেই।

যেমন এই তিন দাদুর প্রাত্যহিক ভ্রমণ। তবে ইদানিং ব্যাপারটা নিয়ে একটু দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। কারণ তারা বায়না ধরেছে, বহুদিন বাইরে বেড়াতে টেড়াতে যাওয়া হয়নি, তিন ভায়ে মিলে একবার বৃন্দাবন ঘুরে আসবে।

না, এমনিতে তিনজনই মোটামুটি শক্ত সমর্থ, সঙ্গে চার ছেলে, একজন অন্তত যাবেই, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাদের চোখ নিয়ে। চোখের অবস্থা আজ দশ বছরের ওপর হল একেবারে শোচনীয়। বাড়ির মধ্যেও একটু দূরে থাকলে মানুষ চিনতে পারে না, খবরের কাগজ-টাগজ পড়া সে তো কবেই ঘুচে গিয়েছে। এখন ওই পাড়ার চেনা রাস্তায় একটু-আধটু ঘুরে বেড়ায় সেটা কোনোরকম করে চলতে পারে, কিন্তু বিদেশ-বিভুঁই? নৈব নৈব চ।

আসলে এটা যদি চোখের কোনো ব্যায়রাম হত, কী ছানি-টানি পড়ত তাহলে একটা উপায় ছিল, চোখ খারাপ হলে চশমা নেবে এ আর বেশি কথা কী। আর ছানি হলে তো আরো সহজ ব্যাপার— দশ মিনিটে অপারেশন হয়ে যায়। কিন্তু সেসব কিছু যে নয়, এর নাম হল চালসে! বংশের রোগ, সত্তরের কাছাকাছি বয়স হলেই ধরবে।

সবে যখন অসুখটি ধরেছে, বেশি দিন নয়, বছর আট-দশ আগে হবে, সকলে মিলে দিঘা বেড়াতে গিয়ে সে এক কাণ্ড। এমনিতে সকলে বার হত স্নানের সময় কী বিকেলে সব দল বেঁধে। কিন্তু দাদুদের তো আবার সকালবেলাটা না ঘুরলে খিদে হয় না। কাছাকাছি ঘুরে আসছি বলে বেরোত, আর এক-একটা ঝামেলা বাধাত। কী একটা ফুরিয়েছে বলে মন্টে একদিন রাস্তায় বেরিয়েই অবাক। দুই দাদু রাস্তার ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে, আর ওপাশে একটা পাথরের স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়িয়ে বড় দাদু বলছে— 'কী মশাই, দারুণ অভদ্র তো আপনি! তখন থেকে জিজ্ঞেস করছি কটা বাজে, একটা উত্তর দেবার ভদ্রতা পর্যন্ত আপনার নেই। ছি ছি ছি।'

আর-একদিন তো স্বপ্ননীল দেখে থ'। দূর থেকে একটি বউ আসছে সাদা লোমেভরা একটা ল্যাপ ডগ কোলে করে, আর তিন দাদু চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে ঠায় দেখছে সেদিকে। স্বপ্ননীল চুপি চুপি পেছন দিকে গিয়ে, শোনে তিন দাদুর কথা হচ্ছে :

'দিঘায় বুঝি তুলো সস্তা? জানতাম না তো!'

'তুলো আবার দেখলে কোথায় তুমি, ওটা তো কাপড়ের পুঁটলি।'

'দূর, কী যে বলিস তোরা— চোখের মাথা খেয়েছিস না কী! দেখছিস মেয়েটা একরাশ ফুল নিয়ে যাচ্ছে'— বড় দাদুর গলা।

'ফুল! তোমার মাথা খারাপ? আমি বলছি ওটা তুলো।'

'কাপড়ের পুঁটলি— 'দাঁড়াও না, আমি দেখে আসছি।' ছোট দাদুর গলা। বাধা দেবার আগেই দাদু উঠে পড়েছে। বউটা এসে পড়েছিল সামনে, জিজ্ঞেস করতে গিয়ে সোজা ল্যাপ ডগের গায়ে একখানা হাত দিয়েছে দাদু, আর ল্যাপ ডগের ফ্যাঁস করে এক আঁচড়।

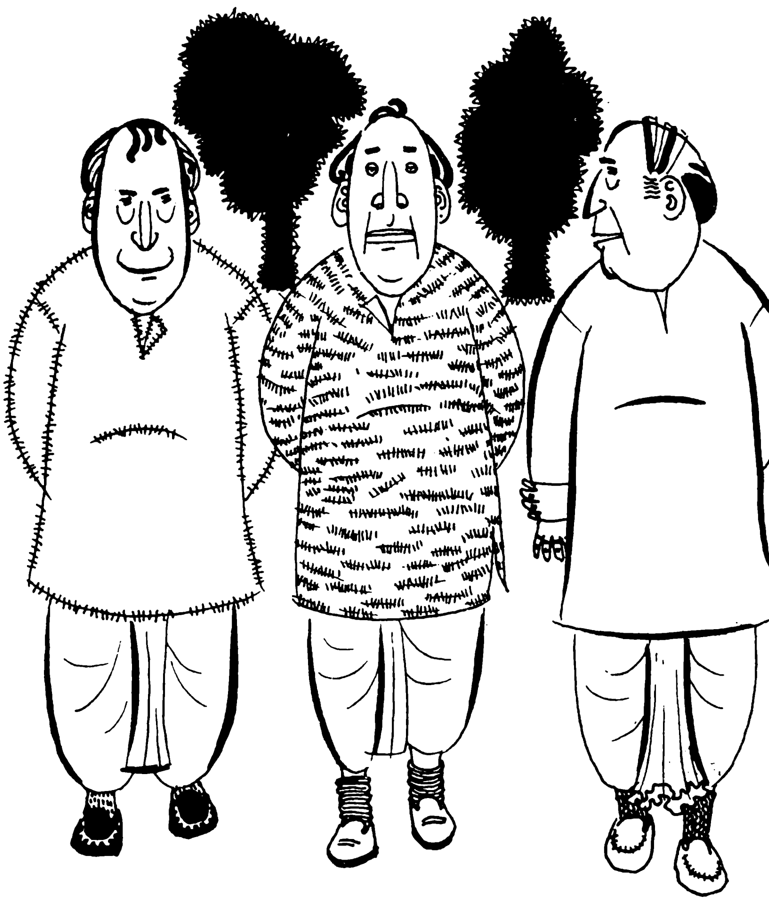

তো, এই দাদুদের একা ছাড়া হবে বৃন্দাবন! ভাবা যায়!

সকলেই তো বুঝছে সে কথা, কিন্তু দাদুরা তো নাছোড়, বলছে, 'আরে বাপ পিতু তো যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে, না কী?' পিতু মানে পীতাম্বর, অর্থাৎ কিনা স্বপ্ননীলের ছোটকাকা। দাদুদের ওপর কথা বলা মানেই ঝকমারি, তবু বড় জেঠু বললে, 'ওই পিতুর ভরসায় তোমাদের পাঠাবো! পিতু তো একটা কাছাখোলা মানুষ, নিজেই পাঁচবার করে দরকারি কাগজপত্র হারিয়ে ফেলছে! ও সামলাবে তোমাদের!'

'হ্যাঁ, সামলাবে। বলি রেলের একটা বড় অফিসার তো বটে, তো সে কাজটা ও সামলাচ্ছে কী করে!' বড় দাদুর যুক্তি।

'আর সামলাবার আছেই বা কী!' মেজদাদু বলেছে, 'আমরা কি কচি খোকা নাকি? একটু ঘুরব ফিরব, মন্দির-টন্দির দেখব—

'দেখতে পেলে আর দুঃখ কী ছিল'— মেজ জেঠু বলার চেষ্টা করলে, 'দেখবে না আমাদের ভেলকি দেখাবে সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'একটা কথা বলবো বাবা'— ছোটকাকিমা এগিয়ে এল। এটাই অবশ্য প্রায় শেষ ভরসা। ছোটকাকিমা টেলিফোনে কাজ করে, বলিয়ে কইয়ে মানুষ। দাদুদের আবদার আর বায়নাক্কা সামলাতেও ওস্তাদ, বললে,

'আমাদের সঙ্গে চলুন, অবশ্যি আমাদের সঙ্গে যেতে যদি আপনাদের ভালো লাগে।'

'মানে? কোথায় যাবে তোমরা?'

'বৃন্দাবন। আপনার নাতি তো সেই কবে থেকে বলছে?'

'কে, গুবরে! বৃন্দাবন যাবে বলছে?' মেজ দাদুর দু'চোখে বিস্ময়, 'বলো কী বৌমা, পুরী দার্জিলিং ছেড়ে বেন্দাবন যাবে ওই গুবরে? বিশ্বাস হয় না।'

'হ্যাঁ বাবা, সত্যি। আমরাও তো ভাবছিলাম একবার ঘুরে আসতে পারলে—'

'যাবে তোমরা? তো চলো না— পিতুকে বললে টিকিটের ব্যবস্থা করাটা তো কোনো ব্যাপারই নয়। বলে দাও ওকে।'

'এখন।' অসহায় মুখ করে ছোট কাকিমা বলেছে— 'বছরের এই মধ্যিখানে আমরা কী করে যাই বলুন দিকি! পুজোর ছুটিতে যদি বলেন—'

'না না না, অত দেরি করে যাওয়াটা ঠিক'—

'কেন বলো দিকি বাবা'— বড় জেঠু মুখ ফিরিয়ে বললে, 'কেষ্ট ঠাকুর পালিয়ে যাবে?'

'থাম দেখি!' এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে বড়দাদু— 'বেশি জ্যাঠামি করিস না। বলি পেটে বিদ্যে তো আছে, শুভস্য শীঘ্রম্ বলে একটা কথা আছে শুনেছিস।'

'হ্যাঁ, মানে'—

'মানে জানিস কথাটার? শুভ সংকল্প একটা মাথায় এনে সেটা ফেলে রাখতে নেই। ধম্মোকম্মের ব্যাপার, মনে যখন একবার হয়েছে তখন সেরে ফেলাই ভালো।' এরপর আর কথা চলে না। একরাশ পাকা চুল মাথায় নিয়ে বড়ো জেঠু পর্যন্ত যখন বোঝাতে পারল না, তখন কচি-কাচারা যে কেউ নিরস্ত করতে পারবে না, এ তো বোঝাই যায়। তবু একবার শেষ চেষ্টা হল রাতে খাবার সময়।

'না, মানে কাজের খুব চাপ ছিল তো, সেইজন্যে আর—'

'কাজের চাপটা কাল একটু কম রেখো দয়া করে।'

'কালকে না কাকা, পরশু রাখবে'— বললে বড়ো জেঠু, 'যেতেই যদি হয় একা একা, কাল তাহলে একটা কাজ করতে হবে তোমাদের।'

'মানে!' বড় দাদুর কপালে বাড়তি একটা ভাঁজ— 'কোনো শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছিস মনে হচ্ছে!'

'শর্ত নয়, একটা খেলা— ছোট্ট একটা খেলা!' বড় জেঠু বললে, 'চয়ন কথাটা বললে বলেই অবশ্য খেয়াল হল।

চয়নদাকে স্বপ্ননীল চেনে। যে লাইব্রেরিতে গিয়ে দাদুরা বসে, তার লাইব্রেরিয়ান। বয়সে স্বপ্ননীলদের চেয়ে অনেক বড়ো, তবে ছোটকাকুর চেয়ে ছোট। হিসেব মতো দাদুদের জেঠুই বলা উচিত চয়নদার, কিন্তু সে দাদুই বলে। দাদুদের তো আর বইপড়ার মতো চোখ নেই, তবে চয়নদার সঙ্গে গল্প করতে ওরা ভালবাসে।

চয়নদার কথা শুনে বড় দাদু আর একবার ভুরু কোঁচকাল, বলল, 'চয়ন আবার কী বলল?'

'না, তার সঙ্গে তোমার বৃন্দাবন যাবার কোনো সম্পর্ক নেই। ও বলছিল লাইব্রেরির কথা।'

'কী কথা?'

'কাল বিকেলে নাকি একটা খুব জরুরি নোটিশ দেবে চয়ন।'

'কিসের নোটিশ? কী লেখা থাকবে তাতে?'

'সেটাই তোমাদের পড়তে হবে।'

'মানে?'

'মানে নোটিশটা কী নিয়ে, তাতে কী লেখা থাকবে সেসব কিচ্ছু আমি জিজ্ঞেস করিনি। ইচ্ছে করেই করিনি। তোমরা তো বলো তোমাদের চোখ ঠিক আছে— তো কালকে তার একটা পরীক্ষা হয়ে যাক।'

'ফাজলামি করছিস?'

'একটুও না। তোমরা যদি তোমাদের গোঁ বজায় রাখো, তাহলে আমরাও এটুকু প্রমাণ না নিয়ে তোমাদের একা ছাড়তে পারবো না।

তিন দাদুই চুপ। বুঝতে পেরেছে এখানে আর কোনো ওজর-আপত্তি চলবে না। সেটা বুঝেই বোধহয় মেজদাদু বললে, 'কী করতে হবে আমাদের?'

'ওটা বিকেলে গিয়ে তোমাদের পড়তে হবে।'

'তিনজনকেই?'

'তিনজনকেই।'

'সেটা দেখবে কে?'

'চয়নকেই বলতে পারি দেখতে, তবে'— বড় জেঠু দু-এক সেকেন্ড কী যেন ভেবে বলল, 'না, ওকে আর এসব ব্যাপার জানিয়ে লাভ নেই। ঘরের ব্যাপার বাইরে নিয়ে গিয়ে কী লাভ! ঘেঁটুই বরং যাবে তোমাদের সঙ্গে।'

ঘেঁটু মানে স্বপ্ননীল। ঘেঁটু নামটা তার মোটেই পছন্দ নয়, তবে এতো বড় একটা কাজের দায়িত্ব পেয়ে সে উল্লসিত।

বড় দাদু বললে, 'পড়তে পারলে আর আমাদের যাওয়া নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করবি না তো?'

'একদম না।'

'তাহলে, তাহলে'— দু-একবার চোখে চোখে কী একটা কথা হয়ে গেল তিন দাদুর, বড় দাদু বললে, 'আমরা রাজি।'

ভালো করে সকাল হয়নি তখনও, বড়দাদুকে দেখা গেল একা একা চলেছে বুড়ো শিবতলার পাশ দিয়ে পুরনো রিক্সা স্ট্যান্ডের দিকে। ছোট স্টেশনারি দোকানটা ঠাহর করে তার গা ঘেঁষা গালি দিয়ে একেবারে চয়নের

বাড়ির কাছে গিয়ে থেমেছে বড়দাদু। দরজায় দু-চার বার টোকা দিয়ে বলেছে, 'চয়ন আছ নাকি, চয়ন—'

দরজা খুলে যাকে দেখা গেছে সে চয়নই বটে, তবে উস্কোখুস্কো চুল আর ঘুম-জড়ানো চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, এটা তার ওঠবার সময় নয়। কিন্তু সামনে বড়দাদুকে দেখেই হন্তদন্ত হয়ে বললে, 'আরে, কী আশ্চর্য, আপনি এলেন কেন! আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হত।'

'হলে কি আর আসি ভায়া এই সাতসকালবেলা?'

'তাই তো ভাবছি! আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।'

'ক্ষেপেছ!' ভেতরে গেলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে।' বড়দাদু গলাটা একটু নামিয়ে বললে, 'কনফিডেনশিয়াল ব্যাপার, তুমি কিন্তু কথাটা ফাঁস করতে পারবে না।'

'মাটি করেছে! এই সাতসকালে এসেছেন— তার ওপর কনফিডেনশিয়াল, ফাঁস করতে পারব না— আমার তো হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে।'

'আরে দূর, সেসব কিছু না। তুমি শুধু কথা দাও, এব্যাপারে কাউকে কিছু বলবে না।'

'কিন্তু কথাটা কী?'

'তুমি লাইব্রেরির ব্যাপারে একটা জরুরি নোটিশ দেবে আজ বিকেলে, তাই তো?'

'হ্যাঁ, দেবই তো। বাংলা টাইপও তো করিয়ে রেখেছি কাল।'

'বাঁচালে। নোটিশটা কী বলো তো?'

'গত বছর একটা কম্পিউটার কেনা হয়েছে তো! এ বছর একটা বাংলা সফটওয়্যার কিনে ফেললাম— ওই যে সংসদ বার করেছে। তো কম্পিউটারের সব টাকাই তো শোধ হয়নি। তাই মেম্বারদের কাছে ডোনেশন চেয়ে একটা নোটিশ দেব আর কী! খরচটা তুলতে হবে তো!'

'ঠিক কথা। এবার কাগজটা একবার নিয়ে এসো দিকি চুপি চুপি।'

'অ্যাঁ!'

'আরে ভাষাটা রপ্ত করতে হবে না?'

'লেখাই তো থাকবে কাগজে, সেটা আবার'—

'আরে, যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলো কেন! জীবন-মরণ সমস্যা, যাও যাও— নিয়ে এসো চটপট।'

নিয়ে আসতে হল নোটিশটা চয়নকে, পড়তেও হল তাকেই— 'সকল সভ্য-সভ্যার অবগতির জন্য জানাই, গ্রন্থাগারে একটি বাংলা সফ্টওয়্যার ক্রয় করা হইয়াছে। উহার মূল্য পরিশোধের জন্য সকলকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।'

পড়া শেষ করে চয়ন বললে, 'লিখে দেব?'

'না না, মনে থাকবে। স্মরণশক্তিটা মোটামুটি ঠিকই আছে এখনও। তুমি কিন্তু আমার কথাটা বলবে না কাউকে।'

'সে ঠিক আছে, কিন্তু কেন এসব করছেন—'

'পরে বলব। এখন নয়।'

দরজাটা বন্ধ করে সবে বাকি ঘুমটুকু পুষিয়ে নেবার জন্যে বিছানায় গা ঠেকিয়েছে, দরজায় ফের খট্ খট্ খট্।

চোখ কচলে দরজা খুলেই চক্ষু স্থির।। এবার মেজদাদু।

কিছু বলবার আগেই মেজদাদু বললে, 'দাদাকে দেখলাম মনে হল রাস্তায়। এসেছিল নাকি তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ, মানে একটা বিশেষ দরকারে— কথাটা অবশ্য কাউকে বলতে বারণ করেছেন—'

'আজ বিকেলের নোটিশটা পড়ে নেওয়া তো?'

'অ্যাঁ! হ্যাঁ, না, মানে'—

'পড়ে দিয়েছ?'

'কী করব, মানে যা শুনে তো উনি—'

'আর একবার আনো ওটা।'

'আবার আনব? কেন, মানে— যা লেখা ছিল সবই তো উনি—'

'আঃ, আনই না ছাই।'

এল নোটিশ। মেজোদাদুর চোখে তো সবই ঝাপসা। তবু জিজ্ঞেস করলে, 'নোটিসের মূল বয়ানটাই তুমি পড়েছো, তাই তো?'

'হ্যাঁ, ভেতরের অংশটা।'

'একদম ওপরের লাইনটায় কী লেখা আছে?'

'একটু বড় বড় করে? লেখা আছে— সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।'

'চমৎকার। এবার তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে পার।'

'নিশ্চিন্ত আর হতে পারছি কই দাদু, আপনারা কী যে করছেন, কিছুই তো—'

'বুঝতে পারছ না? সব বুঝতে পারবে। আপাতত আমি যে তোমার কাছে এসেছি, এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে থেকো, কেমন? চলি!'

এবার আর শোয়নি চয়ন। শোয়ার সময়ও আর ছিল না। ঠিক জানতো ছোটদাদুর পালা এবার। হলও তাই। সংলাপও সেই একই— 'দাদা এসেছিল মনে হল?'

শেষপর্যন্ত কী পড়া-টড়া হয়ে গিয়েছে জানার পর ছোটদাদু বললে, 'আমার জন্যে তো আর কিছুই বাকি নেই দেখছি। একেবারে নিচে ওই লাইনটায় কী লেখা আছে বলো দিকি।'

'লেখা আছে— সফ্টওয়্যার দেখার সময় পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।'

'দেখার সময়'— মনে মনে বিড় বিড় করল ছোটদাদু, 'পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। ভেরি গুড। কথাটা কাউকে বলো না চয়ন, মানে আমার আসার কথাটা।'

'পাগল! বলব কেন!' চয়ন শুকনো মুখে হাসল। পেছন ফিরল ছোটদাদু।

ঘেঁটু ওরফে স্বপ্ননীল সঙ্গেই এসেছিল বিকেলে। দাদুরা যখন এল, সবে নোটিশটা লটকানো হয়েছে তখন। আঠা শুকোয়নি।

'কী হে চয়ন বাবাজী'— সকলের অলক্ষ্যে একটা চোরা চাউনি ছুঁড়ে বড়দাদু বললে, 'নতুন নোটিশ আবার কী হল'?'

'আজ্ঞে ওই দরকারী একটা ব্যাপারে, ওটা না দিয়ে ঠিক— পড়ে দেব?'

'আরে না না, একটা নোটিশ পড়তে পারবো না!' বড়দাদু মুচকি হেসে তাকাল স্বপ্ননীলের দিকে, বললে, 'আয় দেখি ঘেঁটু, লেখাটা পড়তে পারি কিনা দেখি।'

না পড়তে পারার কোনো কারণ ছিল না। সারা সকাল-দুপুর অন্তত বার-পঞ্চাশেক আওড়ানো হয়েছে ওটা মনে মনে। সুতরাং বড়দাদু গড় গড় করে পড়ে দিল, 'সব সভ্য-সভ্যার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, পরিশোধের জন্যে সবাইকে সাধ্যমত অর্থসাহায্য করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।'

সাবাশ! মনে মনে নিজেকেই নিজে বাহবা দিল বড়দাদু। একেবারে ঠিকঠাকই উগরে দেওয়া গেছে ব্যাপারটা।

কিন্তু এরপরও চয়ন অন্যদিকে চেয়ে আছে কেন! ঘেঁটুর মুখটাও যেন কেমন ফিচেল ফিচেল— কেমন যেন ব্যঙ্গের হাসি মনে হচ্ছে। দুটো একটা শব্দ ভুল হয়ে গেছে? হতেই পারে। প্রখর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষও ঠিকঠাক পড়তে পারে না, সেটা জানিস তুই! মিচকে কোথাকার!'

ভাবার সময় ছিল না অবশ্য, আগেই মেজ সামনে এসে গেছে। কথাও ছিল সেইরকমই। যেন দূর থেকেই নোটিশটা দেখতে পেয়েছে, এইভাবে বললে, ও বাবা, নতুন নোটিশ ঝোলালে নাকি ভায়া! দেখি দেখি, কী লিখেছ—'

যেন সবচেয়ে ওপরের লাইন থেকে আগে শুরু করছে, এইভাবে জায়গাটায় আঙুল দিয়ে পড়তে লাগলো, 'সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি। বাপরে বাপ, কী বিজ্ঞপ্তি গো?'

'দেখুন না পড়ে— মানে ওই একটা নতুন জিনিস কেনা হয়েছে, তাই যাতে মেম্বাররা সবাই—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বাংলা সফ্টওয়্যার— কার কাছে শুনছিলাম যেন কথাটা!' বলতে বলতে একেবারে হন্তদন্ত হয়ে ছোটদাদু মাথা গলিয়েছে। মেজদা আর স্বপ্ননীলকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে গভীর আগ্রহের সঙ্গে ঝুঁকে

পড়ল একেবারে নীচের অংশে, বললে, 'দেখি দেখি, কবে থেকে দেখতে পাবে এটা— কী চয়ন ভায়া, জানাওনি সেটা? এই তো, সফ্টওয়্যার দেখার সময় পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। যাঃ ব্বাবাঃ পরে জানাবে? এখন কম্পিউটার জানা লোকের ব্যবস্থা হল না বুঝি?'

প্রশ্নটা করা হয়েছিল চয়নকে, অথচ তার আগেই এমন হিক্কা তুলে হাসতে শুরু করেছে স্বপ্ননীল, যে ছোটদাদুর মেজাজ খাপ্পা হয়ে উঠল। মেজদাদু পাশেই ছিল, তারও সেই একই অবস্থা। বড়দাদুর একটু তফাতে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখেলে মোটেই অবিচলিত থাকতে পারলো না, হন হন করে এগিয়ে এসে বলল, 'আ গেল যা, হাসছিস কেন ওরকম জগা-পাগলার মতো?'

'তাই না তাই! এই ঘেঁটু, হচ্ছে টা কী!' মেজদাদু যোগ দিয়েছে।

'ফিচলেমি হচ্ছে, তাই না?' ছোটদাদু চোখ বড় বড় করলে।

কিন্তু যার উদ্দেশে এতো সাবধান-বাণী, তার বিশেষ হেলদোল আছে বলে মনে হচ্ছিল না।

হাসিটা কেমন ভেতর থেকে উঠে আসছে যেন। বলির পাঁঠাকে চান করালে যেমন হয়, থেকে থেকে কেঁপে উঠছে শরীর, ঝটকা দিয়ে উঠছে। কথা বলার ক্ষমতা নেই, হাত দেখিয়ে বলতে চাইছে— বলছি, বলছি ব্যাপারটা— একটু সবুর করো।

কিন্তু সবুর করার সময় কি আর তিন দাদুর আছে নাকি! অগ্নিপরীক্ষা বলে কথা। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য— বলে গিয়েছেন মুনি-ঋষিরা। চোখে দৃষ্টির জোর নেই তো কী হয়েছে, মাথায় বুদ্ধির জোর তো আছে। তার সাহায্যেই বাজি মেরে দিয়েছেন প্রায়। এখন ওই পুঁচকে ছেলেটা তীরে এসে তরী ডোবাবে, সে তো আর হতে পারে না।

ঘেঁটুর অবস্থা বেগতিক দেখে ছোটদাদু চয়নকেই জিজ্ঞেস করলে, 'কী ব্যাপার বলো তো হে! ছোঁড়াটা এত হাসে কেন! ভূতে ধরল নাকি?'

'না, বাধহয়— নিজেকে ততক্ষণে সামলে নিয়েছে চয়ন।

'তাহলে? কিছু ভুল পড়লাম আমরা?'

'হ্যাঁ, মানে সেই জন্যেই বোধহয়—'

'কী!' চোখে কমজোরি হলেও কানে খাটো নন বড়দাদু। ছুটে এসে গলা নামিয়ে বললে, 'সকালে শুনে যাওয়া ইস্তক এতোবার রিহার্সাল দিলাম, আর তুমি বলছ—'

'না না, সে তো ঠিক আছে। আসলে ছোট্ট একটা গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে।'

'কী গোটা?'

'যে নোটিশটার কথা সকালে বলেছিলাম, এটা তো সে নোটিশ নয়।'

কয়েক মুহূর্তে অখণ্ড অবসর। ঝড় ওঠার আগের নিস্তব্ধতা। বোমাটা ফাটল তারপরেই।

'ফাজলামি পেয়েছ! বললে একটা নোটিসের কথা, নিয়ে এলে আর একটা। এই রকম করে আমাদের'—

'শুনুন শুনুন'— প্রায় হাতে-পায়ে ধরেই থামাবার চেষ্টা করছিল্ল চয়ন ওদের, বললে, 'মেম্বাররা যেন নিজেদের বাকি চাঁদা মিটিয়ে দেন, সেই কথাই বলা হয়েছে ওই নোটিসে। দুটো একসঙ্গেই নিয়ে এসেছিলাম। এটা সেঁটে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনারা এসে পড়েছেন, পরেরটা আটকাবার সময় পেলাম কই! সফ্টওয়্যারের নোটিশটা এই দেখুন আমার হাতে ধরা রয়েছে'—

তাই ছিল। কিন্তু তা দেখে উৎসাহিত হবার মতো মনের অবস্থা তিন দাদুর ছিল না। নোটিশ চয়নের হাতে ধরা থাকলেও বৃন্দাবন যাবার সুযোগ যে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, এটা তিন দাদুই বিলক্ষণ টের পাচ্ছিল।

ছবি : সায়ন

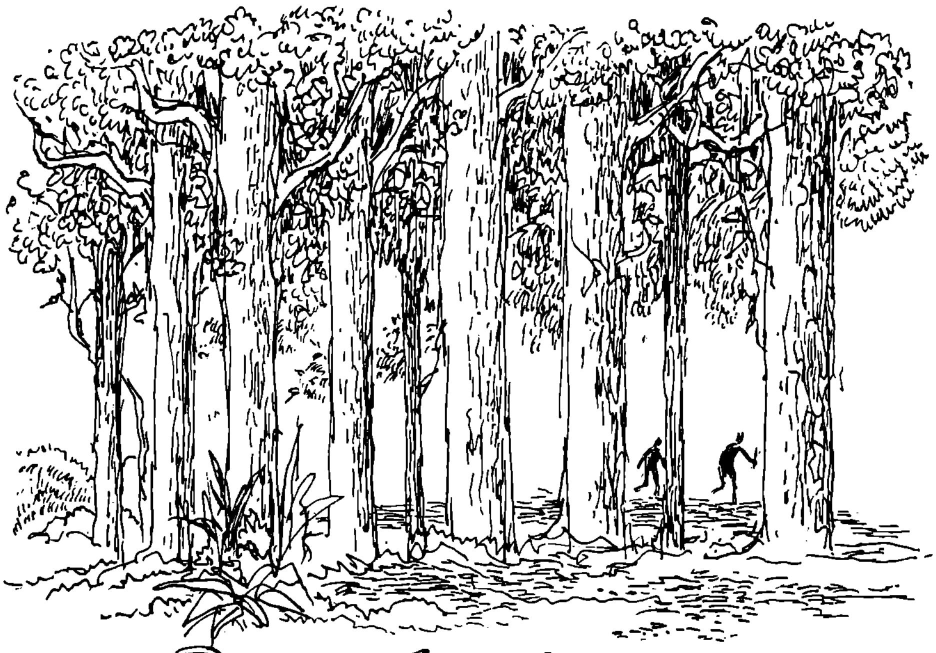

সমুদ্র-দ্বীপে সূর্যগ্রহণ বলরাম বসাক

কতটুকু দ্বীপ আর্কাস। সবটাই বিশাল জঙ্গলে ভর্তি। শুধু এককোণে একটা টিলা। কালো গ্রানাইট পাথরের। টিলার ওপর ডক্টর ফ্রেডারিকোর অবজারভেটারি। আরেকটা অবজারভেটারি আছে দ্বীপের মাঝখানে। সেখানে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে অন্তত পৌনে-এক স্কোয়ার কিলোমিটার। চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে একটা ছোট্ট ভিলেজ বানানো হয়েছে। আলো, জল, বিদ্যুৎ, গাড়ির জন্যে বাঁধান রাস্তা। রাস্তাটা বেরিয়ে এসেছে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একবারে সমুদ্র প্রান্তে টিলার অবজারভেটারি পর্যন্ত। এমন ঘন জঙ্গল দীপু কখনও দেখেনি। বাস্ রে কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, পঞ্চাশ-ষাট মিটার উঁচু। ভেতরে ভেতরে তিরিশ মিটার উঁচু গাছে ছেয়ে আছে। পাতায় পাতায় জুড়ে যেন পাতার চাঁদোয়া সূর্যের আলো ঢুকতে দিচ্ছে না। জঙ্গলের ভেতরে রোদ নেই, যেন গোধূলির আলো সব সময়। বিকেলে কী বিচ্ছিরি বৃষ্টি, ঝুপ্ ঝুপ্ করে পড়তে শুরু করে। সব সময় মাটি কাদা কাদা, গামবুট পরে হাঁটতে হয়।

'ওতটা ভেতরে যেও না ব্রাদার ডীপু', বললেন আঙ্কেল লবসন, 'পাইথন থাকতে পারে।'

'পাইথন!' দীপুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। শুনেছে সে নীচের ডালে পেঁচিয়ে অপেক্ষা করে ময়াল সাপ। কাউকে কাছে পেলে লাফিয়ে নেমে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। ভয়ও যেমন করে, তেমনই কৌতূহলও— একটা জ্যান্ত পাইথন দেখলে কেমন হয়?

'ভিলেজ থেকে এখন বেরিও না', বললেন চ্যাটার্জিকাকু, 'আমরা একসঙ্গে বেরিয়ে সূর্যগ্রহণ দেখতে যাব।' ভিলেজের ভেতরে যে অবজারভেটারিটা আছে, তা থেকে সূর্যগ্রহণটা নাকি ভালো দেখা যাবে না। যদিও অবজারভেটারির টাওয়ারটা সত্তর মিটার উঁচু, কিন্তু জঙ্গলের ষাট মিটার উঁচু গাছগুলোর জন্যে সমুদ্র-দিগন্ত ভালো চোখে পড়ে না। সূর্যগ্রহণটা নাকি সমুদ্র থেকে কয়েক মিটার উঁচুতে, পশ্চিম দিগন্তে হবে। মিসেস ফ্রেডারিকো বলেন মাঝে মাঝে, 'এমন পিগমির দেশে অবজারভেটারির টাওয়ারটাও হয়ে গেছে পিগমি'। তার পশ্চিম দিগন্তের দিকে গাছের উচ্চতা কয়েকটি স্থানে তিরিশ মিটারের নীচে। সেই সব দিকে সূর্যগ্রহণ দশ মিনিট কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত দর্শনযোগ্য হবে। যদিও এই দ্বীপে একটাও পিগমি থাকে না, তবু মাঝে মাঝে দু'একটা পিগমি আসে জঙ্গলের ভেতরের নদী দিয়ে। জঙ্গলে ঢুকে ঢুকে টাপির শিকার করে।

'টাপির কী?' জিগ্যেস করেছিল দীপু। চ্যাটার্জি অ্যাঙ্কেল কিছু বলতে পারছিলেন না, ভুরু কুঁচকে মিসেস ফ্রেডারিকোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মিসেস ফ্রেডারিকো হা-হা করে হেসে উঠে বলেছিলেন, 'আজ টাপিরের চাপ দিয়ে লাঞ্চ খাবে'। মন্দ লাগেনি। টাপির হচ্ছে বুনো শূয়র।

এই ভিলেজে বাটু, জঙ্গাডু আর ঢোমকুটিরি নামের তিন জন পিগমি আছে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলে। ফাই-ফরমাস খাটে। অনেকের অনেক কাজ করে দেয়। ভারী সুন্দর ড্রাম বাজায় আর নাচে। নদী থেকে বর্শায় গেঁথে বড় বড় মাছ ধরে আনে। ভিলেজেই ওরা থাকে। আর আছে মিস্টার ম্যাকডন। গোরিলার মতো লম্বা-চওড়া, গোরিলার মতোই দেখতে। কিন্তু মানুষটি খুবই ঠান্ডা মেজাজের। বসে বসে বাইবেল মুখস্থ করে। আর ডক্টর ফ্রেডারিকো মিসেস ফ্রেডারিকোর বডিগার্ডের কাজ করে। ওর গায়ে বন্ডের মতো শক্তি, সবাই বলে। ভিলেজে বেশ কয়েকটা কাঠের বাংলো। কোনওটা রেস্টুরেন্ট। কোনওটা ক্লাব। কোনওটা টুক্‌টাক জিনিসের দোকান। মাঝখানের বাংলোর দুটো ঘরের একটা ফ্রেডারিকো দম্পতির শোবার ঘর। অন্যটা বসার বা আড্ডামারার ঘর। ঘরদুটোর পেছনে কম্পিউটার সেন্টার কাম ল্যাব।

ড. ফ্রেডারিকো, মিসেস ফেডারিকো দুজনেই বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও 'নাক্ষত্রিক পদার্থবিদ'। লবসন আঙ্কেলও একজন বিজ্ঞানী। চ্যার্টাজিকাকুর বন্ধু। দীপু, চ্যাটার্জিকাকু আর লবসন আঙ্কেল এই আর্কাস দ্বীপে এসেছে সূর্যগ্রহণ দেখতে। একটু পরেই বেরোতে হবে গাড়ি করে টিলার অবজারভেটারির দিকে।

গাড়িতে ওঠা হল। চ্যাটার্জিকাকু, আমি আর মিসেস ফ্রেডারিকো। ডক্টর ফ্রেডারিকো, লবসন আঙ্কেল এলেন না। ওঁরা ভিলেজেই থেকে গেলেন। সত্তর মিটার টাওয়ারের ওপর সেন্ট্রাল অবজারভেটারিতেই সূর্যগ্রহণ দেখবেন। কারণ, ওখানে যেসব আপ টু ডেট ইকুইপমেন্ট, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীন এবং ইলেকট্রনিক ক্যামেরা সেট বসান আছে, সেগুলো ব্যবহার করে গ্রহণকালীন সূর্যের প্রতিটি মিলিমিটার আলোর রশ্মির গতিবিধি বিশ্লেষণের যতটা সম্ভব সুযোগ পাবেন টিলার ওপরকার অবজারভেটোরিতে। এখানে শুধু সূর্যগ্রহণটাই ভালোভাবে দেখা যাবে কিন্তু এই সব বিজ্ঞানচর্চার এতটা সুযোগ পাওয়া যাবে না। ভিলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা সরু হয়ে (শুধু একটা মারুতির মতো ছোট্টো গাড়ি যেতে পারে, পাশাপাশি দুটো গাড়ি যেতে পারবে না) একটা খরস্রোতা নদীর পারে এল। নদীর ধারে বড় বড় পাথরের চাঁই। তার একটা গোল পাথরের চাঁই নড়াচড়া করছিল। দীপ বলল, 'চ্যাটার্জিকাকু ওটা কী'? 'ওটা আর্মাডিল্লো, নিয়ে যাবে নাকি তোমাদের কোলকাটায়।' গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন মিসেস ফ্রেডারিকা, নদীর ওপর স্টিল রড আর শক্ত কাঠের সেতু। তার ওপর দিয়ে গাড়ি চলল। পাশে বোঙ্গাডু বসে ছিল, ফিক্ করে হেসে ফেলল। বলল, 'আই ব্রিং ইট, আই ক্যারি ফর ইউ আরমাডিল্‌লু।'

চারদিকে গাছে গাছে পাতার ছাতা বা চাঁদোয়া। দুপুরবেলাটাও হয়ে আছে যেন সন্ধেবেলা। রাস্তার ওপর সুতোর মতো সরু, ছেঁড়া ছেঁড়া আকাশ। তাইতে তীরের ফলার মতো রোদ। আর সে কী ভ্যাপসা গরম। দীপ ভীষণ ঘামছে। খালি গায়ে কালো পিগমি বোঙ্গাডু ঘামে চান করছে। সমুদ্রের সোঁ সোঁ শব্দ। বন এবারে একটু হালকা। আর্কাস দ্বীপ খুবই ছোট্ট। এদিকটা গাছের উচ্চতা পাঁচ থেকে দশ মিটার। পাতাগুলো ছোট। কিন্তু বিকেল চারটে হলেও বেশ রোদ। এদিকটায় নাকি কতগুলো কোকো আর জাপোট গাছ আছে। গাড়ি থেকে চোখে পড়ল না। দীপুর ভীষণ ইচ্ছে করছিল গাড়ি থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকে সেই সব গাছ দেখে। যেসব গাছ চোখে পড়ল সেগুলো সবই পাম জাতীয় গাছ। কত যে তোতাপাখি উড়ে বেড়াচ্ছে এদিকটায়। পোকা-মাকড় খুঁজছে।

সমুদ্রটা এতক্ষণে যেন দৃশ্যের মধ্যে ঢেউ-এর মতো ভেসে উঠছে আবার যেন জঙ্গলের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছে। শুরু হল ছোট ছোট পাহাড় ডানদিকে বাঁদিকে। রাস্তাটা ক্রমশ উঁচুতে উঠছে। কোথাও গ্রস্ত উপত্যকা, কোথাও সমতল, কোথাও শঙ্কু আকৃতির টিলা। দেখতে দেখতে চারদিকের মধ্যে তিনদিকে সমুদ্র ঝলমল করে উঠল।

সূর্য নেমে যাচ্ছে পশ্চিম দিগন্তের দিকে। ওই যে অবজারভেটোরির টাওয়ার। হঠাৎ আকাশে একটা শব্দ। অদ্ভুত দেখতে একটা হেলিকপ্টার কিটির কিটির শব্দ করে দ্বীপ আর সমুদ্রের কিনার ঘেঁসে চলে যাচ্ছে।

কপ্টারটার রঙ কালো। দেখতে যেন মাকড়সার মতো। মিসেস ফ্রেডারিকো গাড়ি থামিয়ে দূরবীন চোখে লাগিয়ে ভুরু কুঁচকে দেখতে লাগলেন, 'এই সময়ে এই দ্বীপে ওরা কারা? কী উদ্দেশ্যে? কোন খবর দিয়েছে কি?' ভাল করে দেখতে লাগলেন। কপ্টারটা জঙ্গলের পেছনে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মিসেস ফ্রেডারিকো মোবাইল বের করে বোতাম টিপে বললেন, 'হ্যালো ফ্রেডি...'

সূর্যগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চোখে ফিল্টার লেন্স লাগিয়ে দীপু আর বোঙ্গাড়ু। চ্যাটার্জিকাকু আর মিসেস ফ্রেডারিকো অবজারভেটোরির ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। ছোট্ট গোল ঘরে, দু'জনের বেশি জায়গা নেই। পশ্চিমদিকে একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি। সেইদিকে লম্বা টেলিস্কোপের মুখটা ঘুরিয়ে চ্যাটার্জিকাকু মাঝে মাঝে দেখছেন। মিসেস ফ্রেডারিকোর সুন্দর স্নেহমাখা মুখখানা আচমকা গম্ভীর আর লালচে হয়ে উঠছে। বড্ড চিন্তিত দেখাচ্ছে। ছোট্ট ঘরে গরম। বাইরে সূর্যের অর্ধেক কালো হয়ে গেছে। চারদিকে আলো কমে যাচ্ছে। পূবদিকের ঘুলঘুলিতে দেখা যাচ্ছে ঘন কালো মেঘ আর অন্ধকার। পাখিরা আর্তচিৎকার করে দল বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। গরম যেন ক্রমশ বাড়ছে। টুপটুপ্ করে ঘাম ঝরছে মিসেস ফ্রেডারিকোর গাল বেয়ে। তিনি মাঝে মাঝেই মোবাইলে কথা বলছেন সেন্ট্রাল অবজারভেটোরির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। চ্যাটার্জিকাকু টেলিস্কোপ থেকে মুখটা তুলে বললেন, 'অত চিন্তিত হবেন না মিসেস ফ্রেডারিকো, এই দ্বীপ থেকে সূর্যগ্রহণের পূর্ণগ্রাসটা ১০ মিনিট ধরে ভালভাবে দেখা যাবে, তাই হয়তো হেলিকপ্টারে দর্শক ঢুকে পড়েছে। অন্যত্র তো এত ভালভাবে দেখবার সুযোগ নেই।'

'হয়তো তাই, সে তো ওরা কপ্টারে চেপেই দেখতে পারে, আমাদের দ্বীপের ভেতরে ঢোকার কী দরকার?' বলতে বলতে মোবাইলটা রেখে কম্পিউটারের সামনে বসলেন। বোতাম টিপে জানালা খুললেন। পূর্ণগ্রাস শুরু হয়ে গেছে। গোল কালো সূর্যের চারদিকে একটা পঞ্চকোণ। 'অরা'। কী অপূর্ব রঙ— না সবুজ না হলুদ, কিরণমালা! কিরণমালাটা কালো সূর্যের চারদিকে বন বন করে ঘুরছে যেন, না ঘুরছে না, যেন বাঁদিকে হেলছে কিরণগুলির পাঁচটা কোণ, কখনও ডানদিকে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল দীপু চারদিকে যেন সন্ধের অন্ধকার। আকাশের পূর্ব প্রান্তের মেঘ মাঝ আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়েছে। তারপর তারা কয়েকটা ঝিকমিক করে উঠছে। আচমকা বুম-বুম শব্দ।

বোঙ্গাড়ু চমকে উঠল। চিৎকার করে কী বলতে লাগল।

বুম-বুম বুম-বুম বুম-বুম...

বোঙ্গাড়ু চিৎকার করে কী বলছে দীপু বুঝতে পারছে না। সূর্যগ্রহণের পূর্ণগ্রাস চলছে। একদিকে একটা আলোর রিঙ-এর অংশ কালো সূর্যের গা ঘেঁসে। সেখানে যেন একটা হীরের আংটি। হীরের দ্যুতি। কিন্তু বোঙ্গাড়ু যে রকম ছটফট করছে, লাফাচ্ছে— সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বোঙ্গাড়ু কেন উঠছে? অবজারভেটারির ঘরের দরজায় ধাক্কা মারল। দেখল মিসেস ফ্রেডারিকো মোবাইলে কান রেখে 'হ্যালো হ্যালো' করে চিৎকার করে যাচ্ছে। চ্যাটার্জিকাকু বিরক্ত। এত সুন্দর সোলার এক্লিপস্ আর মাত্র পাঁচ মিনিট থাকবে। এরমধ্যে একি ঝঞ্ঝাট বেঁধে গেল। বাইরে অত বুম বুম শব্দ কেন? মনে হচ্ছে জঙ্গলের আদিবাসীরা সূর্যগ্রহণকে ভয় পাচ্ছে। তাই বোধহয় মাদল বাজাচ্ছে। কিন্তু বোঙ্গাড়ু ঢুকে পড়ে চিৎকার করে কী বলছে। ওর ভাষা বোঝা যাচ্ছে না।

বোঙ্গাড়ুর চিৎকারে চমকে উঠলেন মিসেস ফ্রেডারিকো মোবাইল হাতে কথা বলতে বলতে সাঁ করে বেরিয়ে এলেন, 'মিস্টার চ্যাটার্জি, ভীষণ বিপদ, পিগমিদের বিগ ড্রাম বাজছে। বিপদ সংকেত পাঠাচ্ছে ডামকুটিরি, সেই পিগমি মেয়েটা।' বোঙ্গাড়ু তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুট লাগাল রাস্তা ধরে।

'এই বোকাটা' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ফ্রেডারিকো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে 'পূর্ণ গ্রাসের অন্ধকারে রাস্তায় জাগুয়ার ছুটে আসবে। বিপদের ওপর বিপদ বাধাস না।' পূর্ণ গ্রাসের গুরুত্বপূর্ণ শেষ পাঁচ মিনিট আর দেখা হল না চ্যাটার্জিকাকুর। সবাইকে গাড়িতে উঠতে হল। বেজে চলছে বুম-বুম বুম-বুম বুম-বুম। আর ওদিকে পূব থেকে মাঝ আকাশ অব্দি মেঘ। বৃষ্টি পড়ছে টুপ্-টাপ্।

মধ্যজঙ্গল পেরিয়ে এসেছে গাড়িটা। সেন্ট্রাল অবজারভেটারি আর মাত্র কুড়ি মিনিট দূরে। আওয়াজটা এখন বুম বুম বুম নয়, শোনাচ্ছে ঢুং ঢুং ঢুং ঢুং। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড় করালেন মিসেস ফ্রেডারিকো। টর্চ আর রিভলভার

হাতে গাড়ি থেকে বেরোলেন। পিগমিদের ভাষায় কী যেন বললেন, সঙ্গে সঙ্গে বোঙ্গাডু বিষমাখা বর্শা নিয়ে নেমে ছুটে এসে মিসেস ফ্রেডারিকোর পাশে, বলল 'ইয়া, ইয়া'। হ্যাঁ একটা গোঙানির শব্দ। আরেকটা ক্ষীণ ধস্তাধস্তির শব্দ। চ্যাটার্জিকাকু ধমকে বললেন, 'তুই বসে থাক, নামবি না।' মিসেস ফ্রেডারিকো বোঙ্গাডুকে নিয়ে অনেক দূর চলে গেছেন। পেছন পেছন টর্চ আর পিস্তল নিয়ে চ্যাটার্জিকাকু। দীপুর নামতে সাহস হল না।

হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠল। দীপু কানে তুলে নিল 'হ্যালো, আমি দীপু। আমরা বিগ ড্রামের বিপদ সংকেত শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অবজারভেটোরি থেকে ছুটে এসেছি। ওরা নেই। আমি গাড়িতে একা। ওরা একটা মানুষের গোঙানির শব্দ শুনে— আর একটা ধস্তাধস্তির শব্দ— কোথায়? জঙ্গলের ভেতরে। —হ্যাঁ টর্চ আর রিভলভার, পিস্তল নিয়ে আন্টি, চ্যাটার্জিকাকু, বোঙ্গাডু— আমি এখানে। মানে কোথায় আছি বলছি। আমাদের গাড়িটা যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে, সেটার খুব কাছে রাস্তার ধারে একটা পাথরের চাঁই-এ লেখা রয়েছে— ২

কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঙ্গাডু আর মিসেস ফ্রেডারিকো কাকে যেন ধরাধরি করে নিয়ে এল। গাড়ির দরজা খুলে দিল দীপু। ভেতরে পেছনের সীটে যাকে শুইয়ে দিল, তার মুখ থেকে বেরুচ্ছিল 'ওহ্, ইহ্'। দীপু ভাল করে দেখল, তিনি লবসন আঙ্কেল। চ্যাটার্জিকাকু কোথায়! সে কথার উত্তর না দিয়ে মিসেস ফ্রেডারিকো আর বোঙ্গাডু আবার ছুটে চলল বর্শা হাতে। একটু পরে ডক্টর ফ্রেডারিকোর গাড়ি এল। নেমে পড়লেন টর্চ আর বন্দুক হাতে ডক্টর ফ্রেডারিকো, বাটু, আর দু'জন। তাদের হাতেও বন্দুক। একজন, অর্ধচেতন লবসন আঙ্কেলকে দেখে বলল, 'একী, একী করে হল!' ততক্ষণে জঙ্গলের ভেতরে গুলির আওয়াজ। দৌড়ে গেল বন্দুক হাতে দু'জন। বাটুকে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ডক্টর ফ্রেডারিকোও ছুটলেন। কিছুক্ষণ পরে জঙ্গলের ভেতর থেকে বাটুকে ডাকলেন। বাটুও চলে গেল। ওরা যখন ফিরে এলেন, তখন বাটু আর বোঙ্গাডু কাকে যেন ধরাধরি করে নিয়ে আসছিল। পেছন পেছন আসছিল দু'হাতে দুটো টর্চ জ্বেলে বিশালাকায় ম্যাকডন। পেছনে ডক্টর ফ্রেডারিকো আর মিসেস ফ্রেডারিকো কথা বলতে বলতে। তাদের পেছনে টর্চ হাতে চ্যাটার্জিকাকু আর বন্দুকধারী লোক দুটো। বাটু আর বঙ্গাডু কাকে এনে রাস্তার ধারে শুইয়ে দিল, তাকে চেনা গেল না। মুখটা বিচ্ছিরি বদমাইস গোছের। সংজ্ঞাহীন চিড়েচ্যাপ্টা মতন হয়ে পড়ে আছে। গা ভেজা। কাদা মাখা। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিল হয়তো কিছুক্ষণ আগে। ওপরে গাছের পাতা থেকে বড় বড় ফোঁটা পড়ছে।

সেন্ট্রাল অবজারভেটারির নার্সিংহোমে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে আছে বদমাইস-মুখো লোকটা। আর লবসন আঙ্কেল আছে সাধারণ বেডে। তার জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু হাঁটুর মালাইচাকি সরে গেছে, আর পায়ের হাড়ে চিড় ধরেছে। পায়ে, উড়ুতে, কোমরে, পেটে, বুকে নীল লম্বা লম্বা দাগ। রক্ত জমার দাগ। যে লবসন আঙ্কেল দীপুকে পাইথন সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন, সেই লবসন আঙ্কেলকেই পাইথনে পেঁচিয়ে ধরে ছিল। কী করে?

ঘটনাটা শোনা গেল ম্যাকডনের সংক্ষিপ্ত ভাষণ থেকে চায়ের টেবিলে। কালো হেলিকপ্টার সেন্ট্রাল অবজারভেটোরির মাথায় কিটির কিটির করছিল। তাই শুনে নীচে ম্যাকডনের সন্দেহ হল। বাইবেল ড্রয়ারে রেখে, সত্তর মিটার উঁচু টাওয়ারে উঠে দেখে লবসন স্যারকে দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শূন্যে হেলিকপ্টারটা। অবজারভেটোরির পূবদিকের ঘুলঘুলি দিয়ে টেনে বের করেছে। ফ্রেডারিকো স্যার কম্পিউটার সেন্টার কাম ল্যাবে ওপর থেকে পাঠান তথ্য রেকর্ড করছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাথেমাটিক্যাল অ্যানালিসস্ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তথ্য আসা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে, আর মিসেসের মোবাইল ফোনে বার বার সতর্কের বার্তা আসাতে এবারে তিনি চমকে উঠলেন সত্যি সত্যি। ডাকলেন ম্যাকডনকে। ম্যাকডন তখন ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, কপ্টারের আওয়াজটা যেদিকে যাচ্ছে সেই দিকে। পূর্ণগ্রাস শুরু হয়ে গেছিল, ঘোর অন্ধকার। জঙ্গলের ভেতর প্যাচপ্যাচে কাদা। কোথাও জমা জল। ডোবা। কানে বাজছে কিটির কিটির। পাতায় ছেয়ে আছে আকাশ। কপ্টার তাই দৃশ্যের বাইরে। কেবল শব্দ অনুসরণ। সামনে পড়ল নদী। খরস্রোতা। নদীর জলের ওপর দিয়েই ছুটে পার হল ম্যাকডন। তিন তিনটে অ্যালিগেটর এগিয়ে আসতে আসতে শেষে ওদের মধ্যেই কামড়া-কামড়ি শুরু হয়ে গেছিল, তাই বাঁচোয়া। ছুটতে ছুটতে গভীর জঙ্গলে।

ঠিক এই অংশে নার্সিংহোমের সাধারণ বেড থেকে ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বরে পাওয়া লবসনের বয়ান জুড়লে যা দাঁড়ায় :

টেলিস্কোপে চোখ রেখেছিলাম। হঠাৎ কী করে যেন কোমরে দড়ি! পেছনে তাকাবার ফুরসুৎ পেলাম না। একটানে পুবদিকের ঘুলঘুলি দিয়ে হিঁচড়ে টেনে বের করে ফেলল বাইরে। শূন্যে ঝুলিয়ে সেই দড়ি ধরেই উঠে যাচ্ছে মুখোশধারি একজন, হেলিকপ্টারে উঠল। দড়িটা কপ্টারে বাঁধা। ওপরে তাকালাম। মুখোশধারিটা উঠে গেল। আরেকজন ওপর থেকে তাকাচ্ছে। যে তাকাচ্ছে সে ঐ শয়তান গিবস। প্রোটন বোমা বানাবার চেষ্টা করছে বিজ্ঞানী লী। গিবস তার অ্যাসিসট্যান্ট। আমার দিকে তাকিয়ে বদমাইশমুখো হাসল। লী জানে আমি একস-আরজি নক্ষত্রের প্রোটন বিস্ফোরণের ফর্মূলা অ্যানালিসিস করে ফেলেছি। লী আমাকে অফার দিচ্ছে আমার কাজটা প্রোটন বোমা বানানোর কাজে লাগাতে। আমি রাজি হইনি। তখন আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল বোস্টন বন্দরে। ফাঁদ পেতে ছিল আমাকে জাহাজে তুলে নেবার। কী করে যে টের পেল এই নির্জন আর্কাস দ্বীপে আছি। শূন্যে ঝুলে ঝুলে কপ্টারের সঙ্গে যেতে যেতে চোখে পড়ল আকাশে সূর্যের পূর্ণগ্রাস। কালো সূর্যের চারধারে কিরণ বলয়। পাঁচটা সবুজ ও হলুদ শিখা এমনভাবে পড়ছে যে মনে হল লাইটার ধরালে, তার শিখাটাও ঐরকম নড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে লাইটার বের করলাম। দড়িটা মজবুৎ মোটা প্লাস্টিকের। নীচে তাকালাম। তখন পূবদিকের জঙ্গল প্রান্তে গাছের সারি— পাঁচ মিটার থেকে ছয় মিটারের মধ্যে হয়ে থাকে ফিফথ্ লেয়ারে। এইখানে পড়ে গেলে ছোট গাছে পড়ব, তারপর মাটিতে নামতে অসুবিধে নাও হতে পারে। আগুন ধরিয়ে দিলাম। প্লাস্টিকের দড়িতে। জ্বলে উঠল দাউ দাউ। দড়ি ছিঁড়ল। খসে পড়লাম মনে হয় আট-দশ মিটারের গাছে। সেখান থেকে পাঁচ-ছয় মিটারের গাছে, সেখান থেকে তিন মিটার উঁচু গুল্মের গাছে। তারপর কাদায়। কিন্তু ঝপাং করে বুকের ওপর পড়ল কী যেন। ভীষণভাবে পেঁচিয়ে ফেলল পা দুটো হাঁটু কোমর পেট। কী জোরে চাপ দিতে লাগল একটা ঠান্ডা কর্কশ শরীর। আমার মাথা ঘুরতে লাগল।...

ঠিক এই অংশে ফের ম্যাকডনের বয়ান জুড়লে—

আমি ছুটছি কিটির কিটির শব্দ যেদিকে সেদিকে। পায়ে কত বাধা, লতাগুল্মের, শুকনো পচা ডালপালার হাড়-গোড়। ভেঙে পড়া গাছ। কতক্ষণ ছুটছি জানি না। হঠাৎ দেখি কিটির কিটির শব্দটা কাছে, প্রায় মাথার ওপর। বনটা এখানে অনেক হালকা। তেমন বড় বড় গাছের বন নয়। আকাশে আগুন জ্বলছে। লম্বা দড়িতে আগুন।

বেরিয়ে যাচ্ছে দূরে। আর নীচে গোঙানির শব্দ। কোনদিকে মানুষের কণ্ঠস্বরে গোঙানি। কণ্ঠস্বরটা তো চেনা চেনা লাগছে। লবসনস্যারের মনে হচ্ছে! গোঙানিটা যেদিকে সেদিকে ছুটে যেতেই চক্ষু চড়কগাছ। লবসন স্যারকে একটা পাইথন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে থেকে থেকে চাপ মারছে। আমি ছুটে গিয়ে ময়ালের মাথা দুই হাতে শক্ত করে ধরে মোচড়াতে লাগলাম, আর সাপ ছাড়ানোর মন্ত্র আওড়াতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে সাপটা যন্ত্রণায় প্যাঁচ ঢিলে করল, কিন্তু লবসনস্যারের গায়ে জোর নেই, শরীর বোধহয় অবশ হয়ে গেছিল। আমি সাপটার ঘাড় মুড়ে দেবার চেষ্টা করতেই লবসন স্যারকে দ্রুত ছেড়ে সাপটা আমাকে টপকে পেছনে ধপাস করে পড়ল। তারপর বোধহয় আমাকে পেঁচিয়ে ধরবার তাল করছিল দেখে হাত তুলে একটা গাছের ডাল ভেঙে মন্ত্র আওড়ে আওড়ে তাই দিয়ে পেটাতে শুরু করলাম। পাইথন হঠাৎ সর সর করে চলে যেতে শুরু করল। আমি ওর পেছনে ধাওয়া করতেই দেখি দূরে দাঁড়িয়ে আছে গিব্স। অনেক দূরে রেডমাস্কি টিলার ওপর হেলিকপ্টার। নিশ্চয় গিবস আহত লবসনকে তুলে নিয়ে যাবার সুযোগ খুঁজছে। ওর হাতের পিস্তল আমাকে তাক করা। হঠাৎ সেই পাইথন গিবস্‌কে ঝট করে জড়িয়ে ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ফেলল। চেঁচিয়ে উঠল গিবস। হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল। এবার আমি কী করি। একটা লোক মারা পড়বে আমার চোখের সামনে! আমিও তো মানুষ। হঠাৎ মনে পড়ল হেলিকপ্টারে ওর সঙ্গী আরো দু'জন আছে। ওরাই ওকে রক্ষা করবে 'খন। আমি বরং লবসনস্যারকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাই। বলে তাঁকে কাঁধে তুলে দৌড়চ্ছি। দেখি মাদার আসছেন, সঙ্গে বোঙ্গাডু আর চ্যাটার্জিস্যার। তখন মাদার আর বোঙ্গাডু লবসনস্যারকে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলেন। আমি আর চ্যাটার্জিস্যার ফিরে গেলাম গিবসকে বাঁচাতে। দেখি হেলিকপ্টারটা গিবসকে ফেলেই উঠে চলে গেছে। বেচারি গিবস একেবারেই চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে পাইথনের কবলে। ছিল মোটা, হয়ে যাচ্ছে লম্বাটে, সরু, রোগাটে। হাড়-গোড় বোধহয় অনেকই ভেঙে গেছে। যেন পেছন থেকে কে গুলি চালাল। দেখি ঠিক পেছনে রিভলভার তুলে গুলি চালালেন দু'দুটো। প্রথম গুলি খেয়ে সাপটা মাথা তুলল। গিবসকে ছেড়ে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে এল। বলতে গেলে আমার দিকেই এগিয়ে এল। দ্বিতীয় গুলি লাগল মাথায়, মুখ থুবড়ে পড়ল। বোঙ্গাডুর বিষমাখা বর্শায় সাপটার পেট এফোড় ওফোড় হয়ে গেল। আমি গিয়ে গিবসকে তুললাম। গিবসের নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছিল। মুখেও রক্ত। সবকটা হাড় ভেঙে গেছে মনে হল। হঠাৎ বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বাটু আর বোঙ্গাডু আধমরা গিবসকে কাঁধে করে নিয়ে ছুটল। যদি বাঁচান যায়। যদি ওর কাছে শয়তানীর হদিশ পাওয়া যায়।

কিন্তু নার্সিংহোমের সিস্টার এসে জানিয়ে গেল গিবস মারা গেছে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

রাজা-রাজড়ার গল্প

সর্বজিৎ সেন

রেল-মার্জার চক্রবণ্টু কথা

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আটটা পঁচিশে মেল ট্রেন যাবে দিল্লি
কোথায় পালাল চক্রবণ্টু বিল্লি?
শিকারে গেল কি ঘুচিয়ে রাজ্যপাট?
ঘুরবেনা চাকা! হায় একি ঝঞ্ঝাট!
মার্জার খুঁজে সবাই হচ্ছে হন্যে
যত কুলি আর গার্ডবাবুদের কন্যে।
আয়রে বিল্লি, দেখা তোর জুরিজারি
নতুবা অনড় রাত্রের রেলগাড়ি।

হঠাৎ চোখের চকচকে দুই কাচে
রাতের সবুজ সিগন্যাল বুঝি নাচে!
চক্রবণ্টু ছিল যে ব্যস্ত মহা,
মালকামরায় কিছুটি না যায় খোয়া।
তীক্ষ্ণ চক্ষে চক্রবণ্টু ঘোরে
মেল ট্রেন ছোটে বহু দূরে উত্তরে।

এমন দাপট কোন ট্রেনে আছে, কার?
ঘুমের চাকায় রাজা এই মার্জার।
দেখভাল সারে, এই তার অভ্যাস,
কারা নিদ্রিত, কারা জেগে খেলে তাস।
পায়চারি সেরে লম্বা সে করিডরে
দৃষ্টি হেনেছে ড্রাইভারদের ঘরে।
কোন কামরায় কোথায় ঘটছে কী যে
ঘোরাঘুরি করে খোঁজ রাখে একা নিজে।
অতএব তুমি সব উদ্বেগ ভুলে
নিজ কামরায় পাড়ি দাও ঘুমে ঢুলে
মার্জার আছে, অঘটন ঘটবে না
রাতের গাড়িতে এ কথাটা জানে কে না?

রেলের চাকায় তুমি ছুট দেবে বলে
কামরার দোরে নামখানি তব ঝোলে।
ঘরখানি খাসা বিছানাটা পরিপাটি
ঝকঝকে মেঝে নেই কোন ধুলোমাটি।
লাল-নীল কত বাতি ঝোলে দলে দলে
কোনটা বা মৃদু কোনটা বা জ্বলজ্বলে।
বোতামটি টিপে শরীর ঠান্ডা কোরো
ছোট্ট কক্ষে বইবে যে হাওয়া ঝোড়ো।

ঠান্ডা জলের কলখানি নিও খুঁজে,
মুখ টুখ ধুয়ে নাও তুমি সেজেগুজে।
বাইরের হিমে যদি বুজে যায় নাক
জানালার কাচ না হয় বন্ধ থাক।
গার্ডবাবু এসে ভোরে খোঁজ নিয়ে যাবে
খুব কড়া নাকি মৃদু কফি তুমি খাবে?
কোথা কোন ত্রুটি যদি ঘটে যায় পাছে,
চক্রবণ্টু ঠিক আড়ালেতে আছে।
তাই বলি তুমি আরামেতে মেলো দেহ,
ইঁদুর বাঁদর জ্বালাবে না কভু কেহ।
চক্রবণ্টু আছে রাত্রির ট্রেনে—
নির্ভয়ে থেকো এই কথাটুকু জেনে।

তরতাজা থাকে পাহারায় ঘন রাত্রে
কণ্ঠ ভিজিয়ে হালকা সুরার পাত্রে।
তুমি ঘুমে কাদা, রেল করে হুটোপুটি,
মার্জার ধরে মাছি একটি বা দুটি।
কিম্বা যখন দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ি
স্টেশনে তখন করে আসে পায়চারি।
গার্ডবাবুটির হাতখানি রাখে হাতে,
কথা বলে আসে দুটো পুলিশের সাথে।
জানায় তাদের খবরটা দরকারি
কোথায় কখন কটায় থামবে গাড়ি।
ঠিক জানে তুমি নামবে কখন কোথা,
চক্রবণ্টু করবেই সহায়তা
বাদামী রঙের লাঙ্গুলখানি নাড়ি।

হুসহুস করে ছেড়ে যাবে রেলগাড়ি
'ফের দেখা হবে', বলবেই বারবার
চক্রবণ্টু রাতের পাহারাদার।

টি. এস. এলিয়ট-এর **'Skimbleshanks : The Railway Cat'**-এর ছায়ায়

ছবি : প্রণবেশ মাইতি

কেন যে খুকুর মুখখানা ভারী

অশোক সী

কেন যে খুকুর মুখখানা ভারী!
দিয়েছে কি দাদা ওর সাথে আড়ি
ম্যানদি' বকেছে ওকে শুধু শুধু
বই কি ছিঁড়েছে বান্ধবী মধু!

জেঠু কি ভুলেছে আনতে খেলনা?
মা কি মেরেছে দিয়ে সে বেলনা
ধরা পড়ে গেছে খেতে গে' পানটি
পড়া না পারায় বকেছে আন্টি!

কিছুই এ'সব হয়নি তা জেনো
খুকুকে তোমরা ভালোই তো চেনো,
ছুটির দুপুরে সাততাড়াতাড়ি
ভাত-ঘুমে মুখ হয়ে আছে ভারী!

ভেলকি

সিদ্ধার্থ সিংহ

মামার বাড়ি যেতে হবে
যা দূর!
ভেলকি কিছু শিখেছি কাল
জাদুর।

পা বাড়ালেই পৌঁছে যাব
না হয়
সঙ্গে নেব চমকানো সব
যা হয়।

অনেক কিছুই করব, কারণ
হুজুগ
ভাবতেও যা পারবে না কেউ
দু' যুগ।

চেল্লামেল্লি করার যারা
করুক
মঞ্চে কিংবা মনুমেন্টে
চড়ুক।

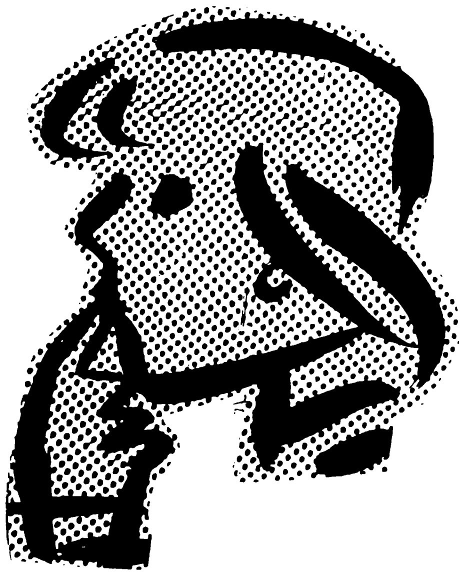

ছবি : প্রণবেশ মাইতি

রাবণ যখন ছোট্ট খোকা

চন্দ্রা মজুমদার

রাবণ যখন ছোট্ট খোকা কীর্তি ছিল কত!
দুষ্টুমি আর বায়না ছিল আর সবারই মতো।
এসব লেখা পাতাগুলো ছিল রামায়ণে
উড়িয়ে নিল ঝড় এসে ওই শান্ত তপোবনে।
এই বছরে মিলল হঠাৎ সে সব খোয়া পাতা,
ছোট্ট করে বলছি তোমায়, নয়তো এসব যা তা!
দুষ্টুমি তার হরেক প্রকার শাস্তি হবে কিসে?
একটা মাথায় গাঁট্টা খেলে অন্যমুখে হাসে।
একটা নাকে সর্দি হলে অন্য নাকে হাঁচে
কুড়িটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে মণ্ডামিঠাই যাচে।
দশটা মাথার লম্বা বালিশ ঘুমিয়ে পড়ার বেলা,
পাঁচটা মাথায় ঘুম এল তো পাঁচ জোড়া চোখ খোলা!
একটা মুখের বায়না শুনেই পাগল হবার জোগাড়,
দশখানা মুখ বায়না ধরে পুলিস ডাকার ব্যাপার।
সকাল হলেই দাঁত মাজতে টুথব্রাশ দশখানা,
দশটা থালায় সাজানো হয় একটা পেটের খানা।
মায়ের খবর বলব কি আর, কী যে দশা ভাই;
দশটা মুখের জন্য দুধের দশটা বোতল চাই।
একটা মুখে গিললো যদি, আর একটা মুখ কাঁদে,
একটা মুখের বায়না আবার এখন যাব ছাদে।
রাবণ রাজার ব্যাপার স্যাপার ভাবছি বসে যত,
একটি খোকাই মায়ের কাছে দশটি খোকার মতো!

কথার কবিতা

পাঁচ কথার প্যাঁচ

শুভেন্দু দাশমুন্সি

বুলবুল বসুর আজ সকাল থেকেই মন খারাপ। একে তো কদিন তার মাথায় ঠিক কবিতা আসছে না, তারওপর কে নাকি তাকে বলেছে, 'কেন যে ছাই কবিতা লেখো! আমরা যেমন কথা বলি তার সঙ্গে এর না আছে মিল, আর না আমরা কিছু বুঝি!' এদিকে জাকার্তায় ইস্টবেঙ্গল জিতেছে বলে কালাচাঁদ আজ সকলকে ইলিশ মাছ ভাজা খাওয়াবে বলেছে। কালাচাঁদের যে ফুটবল নিয়েও এত মাথাব্যথা ছিল, তা আর কে জানত?

কালাচাঁদ ইলিশ মাছভাজা ভর্তি টিফিন কেরিয়ার নিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই বলল, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে বসন্ত।' বুঝতে পারছি আজ সকালবেলার কাগজটা বেশ জমিয়ে পড়েছে কালাচাঁদ। আজকের আনন্দবাজারে এইরকমই একটা লাইন লিখেছে বটে।

রিমঝিম বলে উঠল, 'অ্যাই কালাচাঁদ একদম পেপার থেকে লাইন আউড়ে নিজের জ্ঞান জাহির করতে যেও না।'

'বুঝলেন? বুঝলেন ব্যাপারটা? এখন তো মোহনবাগান সাপোর্টারদের মুখে খুশি, বুকে গম।'

'মোটেই না। তুমি পেপার পড়ে কথা বলছ কিনা, তাই বলছি ওই লাইনটা যে তুমি পেপার পড়ে বলছ, সেটা স্বীকার করো। তা না, এমনভাবে বলছ যেন অমন সুন্দর কথাটা তোমারই বানানো।'

'দ্যাখো মা নির্ঝরিণী— মানে রিমঝিম, কাগজের লোকেরাও কি আর বলছে যে ওই লাইনটা তাদের বানানো নয়, ওটা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন।' ভোলানাথবাবু টেবিল থেকে আজকের কাগজটা তুলতে তুলতে বললেন।

'কী কাণ্ড! সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গোটা একটা বইয়ের নাম *ফুল ফুটুক*। সেই বইয়ের একটা কবিতার নাম 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' আর সেই কবিতারই প্রথম লাইনটা ছিল ''ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।'' তবে কিনা কবিতায় এই লাইনটা বেশ দুঃখের, আর আর আমরা বলি ফুরফুরে আনন্দের মেজাজে।'

কালাচাঁদ সত্যিই আজকের কাগজ থেকে লাইনটা তুলে এনেছিল কিন্তু তার ভেতর কবিতা-দুঃখ-আনন্দ-ফুরফুরে মেজাজ অ্যাত্তোসব আছে, তা বুঝতেই পারেনি। সে ভেবেছিল ভরা বর্ষায় তার পুরন পছন্দের ক্লাব জিতেছে— তাই বুঝি, সেই আনন্দেই এই বর্ষার মধ্যে বসন্ত এসে পড়ছে।

রিমঝিম হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা কালাচাঁদ তুমি মোহনবাগান ছিলে না? ইস্টবেঙ্গল হলে কবে? তুমি তো দেখছি রীতিমত ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো!'

'ওই দ্যাখো', ভোলানাথ বলে ওঠেন, 'আবার কথার মধ্যে কবিতা চলে এল।'

'হ্যাঁ দাদু, রিমঝিম বলে, 'আমি জানি এটা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন।'

'তাই নাকি? তা বলো দেখি কোন কবিতার লাইন।'

'না— মানে— সেটা তো ঠিক—'

'ওই দ্যাখো, ওটা কোনো কবিতারই লাইন নয়। ওটা শক্তির একটা কবিতার বইয়ের নাম : *ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি*।'

'তাই বুঝি? কিন্তু দেখুন কালাচঁদের ব্যাপারটা। এই সেদিন অবধি মোহনবাগান-মোহনবাগান করেছে আর আজ কিনা রাতারাতি দলবদল! কী কালাচাঁদ, তুমি মোহনবাগান ছিলেন কিনা?'

'ছিলামই তো, আর শুধু ছিলাম কেন? আমি তো এখনও মোহনবাগানি। কিন্তু এটা অন্য ব্যাপার। বুঝলে না, এটা হল গিয়ে বিশ্বফুটবলে বাংলার ফুটবলের ব্যাপার।'

'শুধু বাংলার কেন' বুলবুল আনন্দের চোটে বলে উঠল, 'বলো হকি-ক্রিকেট-টেনিস-দাবার পর ফুটবলেও ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

'এটা আবার এক্ষুনি ভাবতে বসাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তোমাদের এই এক মুশকিল, একটা লাইন পেলেই হল, দুমদাম যেখানে সেখানে বসিয়ে দাও।'— এতক্ষণ চুপ করে থাকা লাবণ্যদি এইবার মুখ খুললেন। 'দ্যাখো, বুলবুল যে প্রবল উৎসাহে অতুলপ্রসাদের গান থেকে এক কলি আউড়ে দিলে,

তার আগে টিমটা নিয়ে আরেকটু ভাবো।'

'বলেন কী দিদি? অতুলপ্রসাদ? মানে অতুলপ্রসাদ সেন? আমি তো ভেবেছিলাম এটা রবি ঠাকুরের লেখা! কিন্তু সে যাই হোক, সেদিন আপনি খেলাটা দেখেছিলেন!' কালাচাঁদ উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'ওফ্! একেবারে জান-প্রাণ দিয়ে খেলা যাকে বলে! যাকে বলে একেবারে ডু অর ডাই— করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। ওফ্ এই স্পিরিটটা থাকলে দেখবেন কী হয়?'

'আচ্ছা কালাচাঁদ, এই ডু অর ডাই বা করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গের বাংলাটা কী হবে বলো তো?' প্রশ্নটা করলেন ভোলানাথবাবু।

'কেন? হয় করো, নয় মরো।' রিমঝিমের চকিত উত্তর।

'সেটা ঠিক। কিন্তু জানো কি বাংলায় একটা প্রবচনই আছে এই ব্যাপারটা বোঝাতে।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। হঠাৎ বুলবুল বলে উঠল, 'মনে পড়েছে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।'

'বাহ্। চমৎকার। জানো তো এ কথাটাও বাংলা ভাষায় ঢুকে গেছে একটা কাব্যগ্রন্থ থেকে।'

'ওরেব্বাবা, তাই নাকি', বুলবুল একই সঙ্গে বিস্মিত ও আনন্দিত, 'আমি তো এটা প্রবচন হিসেবেই জানি।'

'হ্যাঁ, তাও আবার হালফিলের কবিতা নয়। আজ থেকে প্রায় আ-ড়াই-শো বছর আগে লেখা!' লাবণ্যদির সংযোজন।

'বলেন কী! আড়াইশো বছর আগের লেখা কবিতা এখনও আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করি!' বুলবুলের সকালবেলার দুঃখ-দুঃখ ভাবটা ক্রমশ কেটে যাচ্ছে।

'তবে? অন্নদামঙ্গলকাব্যে ভারতচন্দ্র রায় লিখেছিলেন, 'যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'।'

'কী, মুনশিজি কি শুধু শুনেই যাবেন? বলবেন না কিছু!'

আমি একটু বিব্রত হলাম। অনেকক্ষণ থেকেই একটা কথা মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছে, বলব কিনা বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ বলেই ফেললাম কথাটা। 'আমার অনেকদিন মনে হয়েছে বাঙালি বাপ-মা নিজেদের ছেলের নাম 'ইন্দ্রজিৎ' কি 'মেঘনাদ' রাখতে আরম্ভ করেছে ১৮৬১ সালের পর থেকে। মানে, আমাদের রবিঠাকুর যে বছরে জন্মালেন, ওই বছরই মাইকেল মধুসূদন দত্ত-র *মেঘনাদ বধ কাব্য* বেরোল কিনা! *মেঘনাদ বধ কাব্য*তেই তো বাল্মীকি রামায়ণের ভিলেন মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিৎ বাঙালির কাছে হিরো হয়ে উঠল! শুধু কবিতা পড়া থেকে এরকম পরিবর্তন আমার কাছে বেশ আশ্চর্য লেগেছিল!'

ভোকাবুলারি সভার সবার বোধহয় বেশ মনে ধরল কথাটা।

'শুধু নামই বা বলছি কেন' আমি বলেই চললাম, 'বুদ্ধদেব বসু তো বলেছিলেন, বাংলায় এমন অনেক শব্দ ছেলে-ছোকরারা ব্যবহার করে বাংলায় যেগুলো প্রথম ব্যবহার করেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। যেমন, ধরো 'অন্বিষ্ট', 'অভিধা', 'ঐতিহ্য', 'প্রমা', 'ব্যক্তিস্বরূপ', 'বহিরাশ্রয়' বা 'আর্ট ফর আর্ট সেক' বোঝাতে 'কলাকৈবল্য'। এমনকী 'ক্লাসিকাল' শব্দের বাংলা হিসেবে 'ধ্রুপদি' শব্দটাও নাকি সুধীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।'

এতক্ষণ চুপ করে বসে বসে সবার কথা শুনছিলেন লাবণ্যদিদি। এবার মুখ খুললেন, 'আমি কলকাতা নিয়ে দুটো খুব চালু কথা বলব। বলো দেখি সে দুটো কোন্ কবিতা থেকে এসেছে? একটা হল 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'। আরেকটা হল : 'কলকাতা আছে কলকাতাতেই'।'

'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে' তো জীবনানন্দ দাশের লেখা, 'সুচেতনা' থেকে।' চটপট উত্তর দিল বুলবুল বসু।

কিন্তু 'কলকাতা আছে কলকাতাতেই'? লাবণ্যদির মুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি। মুখ দেখে মনে হচ্ছে রিমঝিম, এমনকী ভোলানাথবাবুও এই প্রশ্নে কাবু। আমারও মাথায় আসছে না উত্তরটা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল কালাচাঁদ, ডানহাতটা মাথার ওপরে লম্বা করে তুলে বলল, 'আমি বলব দিদি?' মুখে তার হাসি।

সক্কলে তো থ। বলে কী কালাচাঁদ?

'আরে এতো সোজা। *সহজ পাঠ*-এই ছিল। ওই যে "একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু", ছড়াটার শেষেই তো আছে "কীসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই, দেখি কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই।"

সব্বাই হেসে উঠল। বাইরের কেউ যদি ভো-কা-বু-লা-রি সভার এই হঠাৎ-হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করত, তাহলে হয়ত সব্বাই বলত, 'কেন আবার? 'পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই'।' বুলবুল বসুর সকালবেলার দুঃখটা এক্কেবারে কেটে গেছে।

এইবার ইলিশ খাওয়ার পালা।

রাজা গপ্পিদাসের গল্প

সুবিনয় রায়

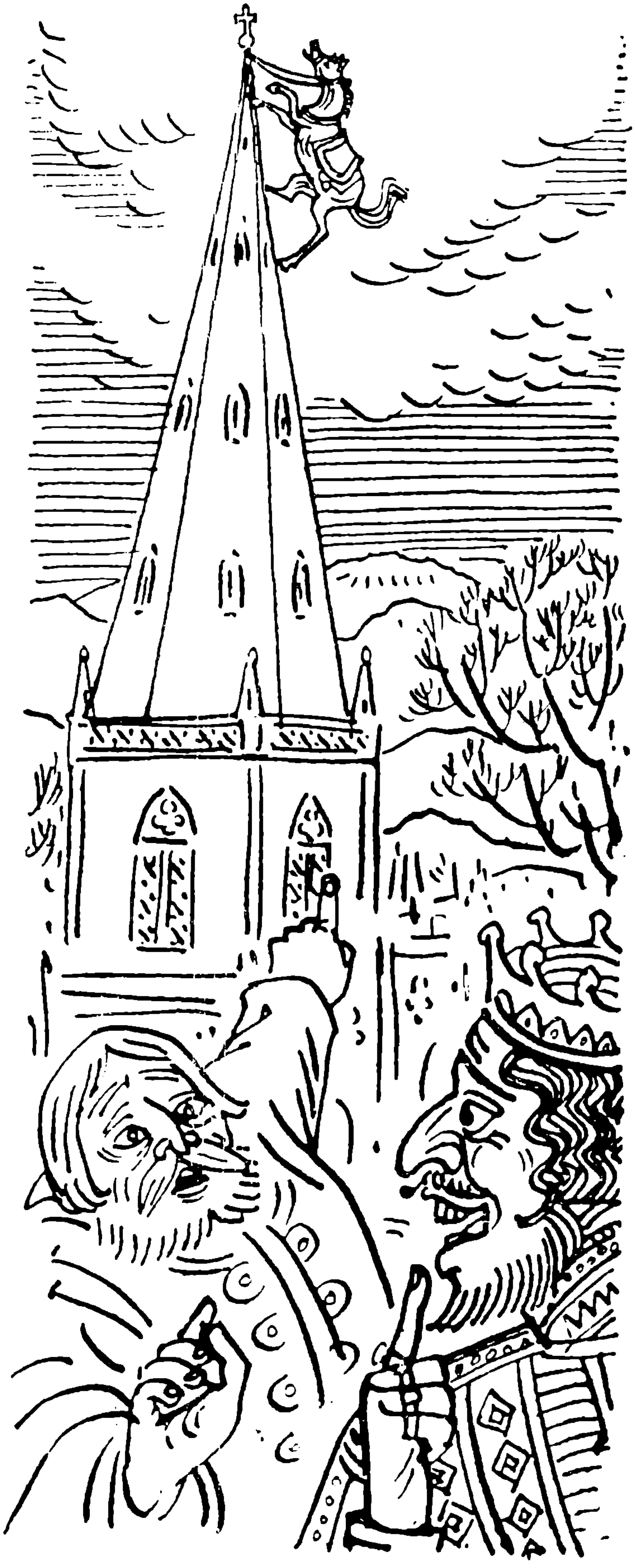

রাজা গপ্পিদাসের একটি সাধের ঘোড়া ছিল। সেটিকে তিনি সর্বদাই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ঘোড়াটির একটা আশ্চর্য গুণ ছিল; — দিনরাত খাটলেও সে সহজে ক্লান্ত হত না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব সময়েই সে খাটতে পারত। যুদ্ধের সময় সে কামানের গোলাকে ভয় পেত না। রাজা গপ্পিদাস সর্বদাই তাঁর ঘোড়ার গল্প করতেন।

একদিন গপ্পিদাস বললেন — একবার আমার সাধের ঘোড়াটিকে নিয়ে যুদ্ধে যাই। শত্রুর সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল; কিন্তু আমি সহজে দমে যাবার পাত্র নই। বিশ্বাসী ঘোড়া থাকলে আমার সাহস কত! যেখানে যুদ্ধ বাধে, সে শহরটির চারিদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। আমি শহরের মধ্যে সটান সৈন্যদল নিয়ে ঢুকে শত্রুদের সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে ঘোর যুদ্ধ করলাম। শত্রুদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল; আমি তাদের তাড়া করলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি, সঙ্গের লোকজন সব অনেক পিছিয়ে পড়েছে। তাদের জন্যে অপেক্ষা করা দরকার। কাজেই ঘোড়া বেচারাকে ইতিমধ্যে একটু জল খাওয়াবার জন্য একটা মস্ত চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে গেলাম! ঘোড়ার বড্ড পিপাসা পেয়েছিল। তাই সে আগ্রহ করে চোঁ চোঁ শব্দে জল খেতে লাগল। কিন্তু, খাচ্ছে তো খাচ্ছেই! প্রকাণ্ড সব চৌবাচ্চার জল শেষ হয়ে গেল, তবুও সে খাচ্ছেই! ব্যাপারটা কী? এত জল তার পেটে ধরে কেমন করে? হঠাৎ পিছনে চেয়ে দেখি, ঘোড়ার পিছন দিকটা একেবারে উড়ে গেছে; পিছনের পাও নেই। কাজেই, বেচারা যত জল খাচ্ছে সবই পিছন দিক দিয়ে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে! এখন কি করা যায়! আগেই খুঁজে দেখা দরকার পিছন দিকটা গেল কোথায়। যেখানে প্রথম যুদ্ধ বেধেছিল সেই জায়গায় গেলাম। গিয়ে দেখি ঘোড়ার পিছনের ভাগটা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে তেজের সঙ্গে পা ছুঁড়ছে। অমনি একজন ডাক্তার ডেকে ঘোড়ার দুটো টুকরো বেশ করে জোড়া লাগিয়ে নিলাম। সে ঘোড়ার এমন তেজ, কয়েকদিন পরেই দেখি, আবার ঘোড়া তাজা হয়ে উঠেছে!

এর কিছুদিন বাদে এক শীতের দেশে গেলাম। সেখানে নাকি অসম্ভব রকমের বয়ফ পড়ে। আমি তো আগে কখনও বরফ পড়া বেশি দেখিনি; কাজেই তত গ্রাহ্যও করলাম না। একদিন সন্ধ্যায় পথে যেতে বরফ পড়া আরম্ভ হল। অমনি আমি ঘোড়া ছুটিয়ে শহরের দিকে যেতে লাগলাম; কিন্তু অনেক দূর গিয়েও শহরের কোনও চিহ্নই পাওয়া গেল না। এদিকে রাতও হয়ে এসেছে, আর পথ চলাও নিরাপদ নয়। কাজেই একটা জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম। জায়গাটা দেখে একটা গোরস্থান বলে মনে হল। কারণ কতগুলো কবরের মতন চুড়ো দেখা যাচ্ছিল। একটা খুঁটির সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরবেলা উঠে দেখি, বরফ-টরফ কোথায় মিলিয়ে গেছে। — আমি এক গ্রামের মাঝে রয়েছি।

সেখানকার লোকেরা আমায় কত আদর যত্ন করল। কিন্তু আমার মন বড় অস্থির হয়ে ছিল; তাদের আদর যত্ন আমি ভুলেই গেলাম; আমার ঘোড়া কোথায় গেল? তাকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না! হঠাৎ শুনি উপর থেকে 'চিঁ হি হি' ঘোড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি চমকে উপরের দিকে চেয়ে দেখি, আমার ঘোড়া একটা মন্দিরের চুড়ো থেকে ঝুলছে; তার লাগামটা চুড়োর আগার সঙ্গে বাঁধা! অমনি দুড়ম করে গুলি করে লাগামটা কেটে দিলাম; — ঘোড়াও তড়াক করে একলাফে নীচে এসে পড়ল। তখন আমার আনন্দ দেখে কে?

এই ঘটনা আমার বড়ই আশ্চর্য মনে হল। কি করেই বা ঘোড়া ঐ চুড়োর উপরে গেল আমিই বা এই গ্রামে কেমন করে এলাম! আমার পাশেই একটি বুড়ো ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন— 'আপনি বুঝি কাল রাত্রে এ গ্রামে এসেছিলেন? তখন চারিদিক বরফ চাপা পড়ে গিয়েছিল, তাই বুঝি আপনি মন্দিরের চুড়োকে খুঁটি মনে করে ঘোড়াটাকে ওখানে বেঁধে রেখেছিলেন? রাতারাতি বরফ গলেছে আর আপনি আস্তে আস্তে নেমে এসেছেন— টের পাননি। কিন্তু, ঘোড়া বেচারি আর করে কি? সে তো ওখানে বাঁধা রয়েছে!' তখন আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।

ছবি : সত্যজিৎ রায়

পুরোনো সন্দেশ থেকে

লায়লী দাশ

আমাদের দেশের বাড়িতে একটা চিড়িয়াখানা ছিল। সবাই বলবে বাড়িতে আবার চিড়িয়াখানা থাকে নাকি? আচ্ছা কোথাও যদি তিনটে ময়না, চারটে টিয়া, দুটো ময়ূর আর একঝাঁক পায়রা থাকে? আর থাকে একটা খরগোশ, একটা হরিণ আর একটা ভালুকছানা। সেটাকে চিড়িয়াখানা বলব না?

সত্যিই এমন ছিল আমাদের। তাঁর মায়ের শখ মেটাতে বাগানের পাশে মস্ত এক চালাঘর তুলে দিয়েছিলেন আমার বাবা। সেই ঘরের দেওয়ালে পেরেক পুঁতে সারি সারি লোহার তার টাঙানো। খাঁচাগুলো তারে ঝোলানো থাকত। টিনের চালের ওপর ঝমঝম করে যখন বৃষ্টি পড়ে, পাখিগুলো ঝিমোতে ঝিমোতে চমকে উঠে, কাঁপতে থাকে। এ দৃশ্য আমার স্বচক্ষে দেখা।

দাদু মারা যাওয়ার পর ঠাম্মা সংসারের কোনও ব্যাপারেই মাথা ঘামাতেন না। এইসব পশুপাখি আর আমাদের তিন ভাইবোনকে নিয়েই তাঁর সময় কাটত।

বনের পশুপাখিদের ধরে বাড়িতে বন্দী করে রাখা তখনও নিষিদ্ধ হয়নি। কাকু ও পিসিরা মাঝে মাঝে রথের মেলা থেকে পাখি কিনে তাঁকে উপহার দিতেন।

গোয়ালঘরে কয়েকটা গোরু ছিল। দেখাশোনার জন্য আলাদা লোক থাকলেও ঠাম্মা নিয়মিত তাদের খোঁজখবর রাখতেন।

হরিণের বাচ্চাটা এনেছিলেন ছোটোমামা আসামের জঙ্গলে পথের ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

সকালবেলা গোরুর সদ্য দোয়ানো গরম-গরম দুধ বোতলে ভরে আমাদের ভাইবোনেদের কারও না কারও হাতে দিতেন ঠাম্মা। মুখের কাছে ধরলেই হরিণছানাটা চুকচুক করে খেয়ে নিত। ওর নাম রাখা হল 'হরিয়া'।

ভালুকছানাটা আনেন ছোটোকাকু। একবার বন্ধুদের সঙ্গে কালাহান্ডি বেড়াতে নিয়ে তাঁর চোখের সামনে

ঘটনাটা ঘটেছিল। এক আদিবাসীর সঙ্গে ভালুকের যুদ্ধ। আত্মরক্ষার জন্য লোকটা তার হাতের টাঙ্গিটা ভালুকের গলায় বসিয়ে দেয়। আহত অবস্থাতেই হামাগুড়ি দিতে দিতে পাশের গুহার মুখেই ধুপ করে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মরা যায় সে। এমন সময়, গুহার ভেতর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এল কালো কুচকুচে নাদুস-নুদুস তিনটে ভালুক ছানা। ওদের দেখেই ঠাম্মার কথা মনে পড়ে গেল কাকুর। গাড়ি থেকে নেমে সবাই মিলে কায়দা করে একটা ছানা ধরে সাবধানে কোলে করে নিয়ে গাড়িতে তুললেন।

ভালুকছানাটা পেয়ে ঠাম্মা কিন্তু একটুও খুশি হলেন না। বড়োবড়ো লোমওলা এই বিদঘুটে জীবটা তাঁর কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। প্রথমত সারা গায়ে লম্বা লম্বা লোমের ভেতর ময়লা-ধুলোবালি আঠার মতো আটকে থাকে। তাকে পরিষ্কার করে স্নান করাতে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। আর একটা চিন্তা, বড়ো হয়ে এই জন্তুটা তাঁর নাতি-নাতনি ও অন্যান্য পোষ্যবর্গকে কী চোখে দেখবে।

'সুবুটার চিরদিন এইরকমই আক্কেল' মন্তব্য করেন ঠাম্মা। মা একবাক্যে সায় দেন।

এইসব পশুপাখি নাড়াচাড়া মা কোনদিনই খুব একটা পছন্দ করেন না। হঠাৎ আঁচড়ে কামড়ে দেবে বা তাদের লোম ও পালক থেকে কখন কোন রোগ সংক্রমণ হবে, সেই ভয়ে বিব্রত থাকেন। শাশুড়ির কথা ভেবে কিছু বলতেও পারেন না। পশুপাখি নিয়ে ঠাম্মার কোনও বাতিক না থাকলেও ভালুক দেখে তিনি আতঙ্কিত। আমরা, মানে আমি দাদা আর ভাইটু কিন্তু খুব খুশি।

বন্ধুদের কাছে জাঁক করে বলি, 'আমাদের বাড়িতে পোষা ভালুক আছে জানিস?'

তারা ভিড় করে দেখতে আসে। গর্বে আমাদের বুক ফুলে ওঠে।

দাদা ওর নাম রাখল, কালুয়া। আমাদের হাতে দুধের বাটি দেখলে সে গুটি-গুটি এগিয়ে আসে। সত্যিকার একটা ভালুকছানা হাতের বাটি থেকে দুধ খাচ্ছে, সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই আনন্দ আমাদের বেশিদিন স্থায়ী হল না।

একদিন ভোরবেলা কালুয়াকে উঠোনের কাঠের উনুনের ছাইয়ের গাদা থেকে উদ্ধার করল দাদা। উনুনে অবশ্য তখন আগুন ছিল না।

উঠোনের একপাশে কালুয়ার ঘর। ইট আর মাটি দিয়ে তৈরি। মাথায় টিনের চালা। একটা টিনের দরজাও লাগানো ছিল। আবার কাঁধ পর্যন্ত উঁচু সেই ঘরে জানলার মতো বড়ো বড়ো দুটো ফোকর। ঘরের মধ্যে বাটিতে দুধ-ভাত বা দুধ-পাউরুটি রেখে দেওয়া হয়। আর একটা বাটিতে জল। খিদে পেলে কালুয়া আপনিই খেয়ে নেয়। নিজে নিজে খেতে সে এখন শিখে গেছে। রাতে ঘরের ভেতর মোটা খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়ে। তখন টিনের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটা ছিল দাদার ডিউটি। সকালে দরজাটা দাদাই খুলে দিত।

যখন খুশি বেরিয়ে আসে কালুয়া। সারাদিন এদিক সেদিক ঘোরে কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে কোনদিন বারান্দায় ওঠে না। হয়তো পারেই না। সন্ধ্যায় ওকে ঠেলে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে হয়। এই তিনমাসের ভেতর কোনদিন সে নিজে থেকে ঘরে ঢোকেনি। ঘরটা বোধহয় ওর পছন্দই হয়নি।

ছাইয়ের গাদা থেকে দাদা যখন উদ্ধার করল, কালুয়ার নাক দিয়ে অঝোরে জল গড়াচ্ছে। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ। চোখে মুখে ছাই ঢুকে সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড।

দাদার চিৎকার শুনে সবাই ছুটে এল। 'কালুয়া কালুয়া, আঃ, আঃ' করে চিৎকার জুড়ে দিল ভাইটু। মা ওকে জোর করে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলেন।

ভালো করে ধুয়ে কালুয়ার মুখটা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিলেন ঠাম্মা। নাকের ফুটোর ভেতরও খানিকটা ছাই ঢুকেছিল। মুখের সামনে দুধের বাটিটা কাত করে ধরলেন। এক চুমুকও খেল না কালুয়া।

আস্তে আস্তে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। সারারাত ঠান্ডায় বাইরে থেকে ওর বোধহয় নিউমোনিয়া হয়ে গেছে। ঘরের দরজাটা রাতে দাদা বন্ধ করেছিল। কিন্তু ছিটকিনি না থাকায় নিজেই টেনে খুলে ফেলেছে কালুয়া। ও যে বড়ো হয়ে উঠেছে আমাদের কারও খেয়ালই হয়নি।

সারাদিন কিছুই খেল না কালুয়া। চোখও মেলল না। জোর করে মুখটা হাঁ করিয়ে তুলোয় করে ফোঁটা ফোঁটা দুধ দেওয়া হল। গিলতে পারল না। ঠোঁটের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।

পরদিনও সেই একই অবস্থা। ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনে তাঁর পরামর্শমত ওষুধ দেওয়া হল। কিছুতেই কোনও

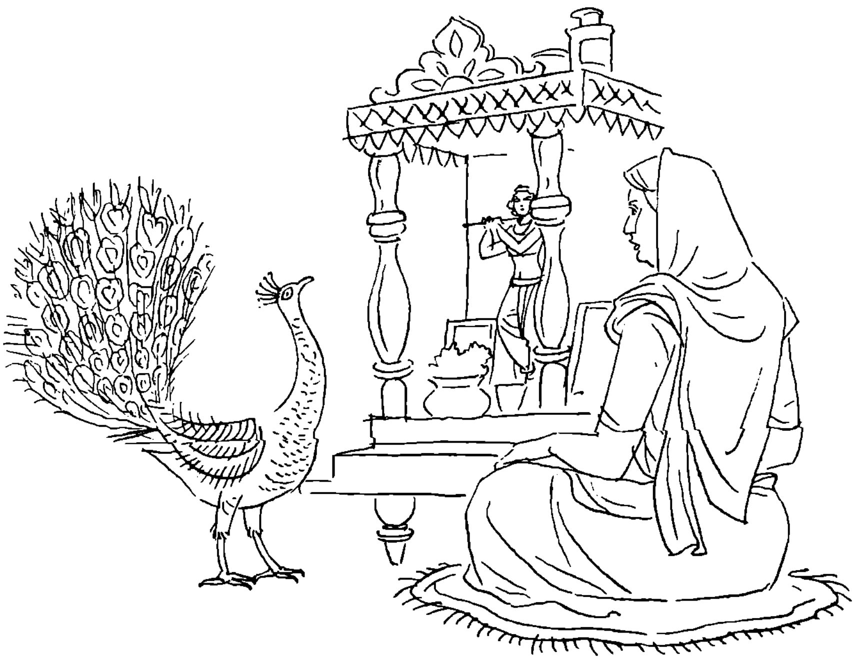

ফল হল না। তিনদিন ভুগে, কালুয়া আমাদের সব চিন্তা ভাবনার অবসান ঘটিয়ে চিরদিনের জন্য চোখ বুজল।

বড়ো হলে কী ভয়ংকর হয়ে উঠবে ভেবে যাঁরা আতঙ্কিত হয়েছিলেন, ওর এই হঠাৎ চলে যাওয়ায় তাঁরাও বোধহয় অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

সময়ের সঙ্গে কালুয়ার শোকও একদিন আমদের মনে ফিকে হয়ে এসেছে। সেবার পুজোর ছুটিতে জগুদা ওরফে জগৎজ্যোতি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। সে আমাদের পিসতুতো দাদা।

জগুদাকে সবিস্তারে কালুয়ার কাহিনি শোনানো হল।

উঠোনে কালুয়ার সেই খালি ঘরখানা দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'ওই খালি ঘরের দিকে চেয়ে দিম্মার মনটা যে অহরহ হু হু করছে রে।'

'তা তো করছেই।' সায় দেয় দাদা।

'এই কষ্ট দূর করবার একটা উপায় বের করতে হবে তো।'

'কী উপায় জগুদা?' ব্যগ্র ব্যাকুল হয়ে উঠি আমরা তিনজন।

'দাঁড়া, দাঁড়া, দুটো দিন চিন্তা করার সময় দে আমায়।'

চিন্তা করার জন্য দুদিন সময়ের দরকার হয় না। পরদিনই একটা উপায় বের হয়ে যায়। আপনা আপনিই।

বাড়ির পেছনের বাগানে আম, জাম, কাঁঠালের সঙ্গে একটা পেয়ারা গাছও ছিল। সারাবছরই তাতে পেয়ারা ফলে। ছুটির দিন সারাটা দুপুর আমরা ওই পেয়ারার ডালেই কাটাই।

শেকড়ের একহাত ওপর থেকেই গাছটা ডালপালা মেলেছে। তাই ওই গাছে চড়তে আমার মতো ভিতু মেয়েরও কোনো অসুবিধে হয় না। দুপুরবেলা একমাত্র ভাইটুকেই জোর করে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন মা।

সেদিন দুপুরবেলা ওই পেয়ারাতলায় আমরা আবিষ্কার করলাম লাল লাল দুটো জীব। ইদুঁরছানার মতো দেখতে। তাদের চেয়ে একটু বড়। কাদামাটি মেখে জুবুথুবু। চট করে সেগুলোকে হাতে তুলে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে জগুদা বলল, 'এগুলো দেখছি কাঠবিড়ালির ছানা।'

'কী করে বুঝলে?' জানতে চাই।

'দেখছিস না ল্যাজের ওপর খয়েরি লোম। সদ্য জন্মেছে। ইদুঁরের ল্যাজে কি লোম থাকে এমন বড়ো বড়ো?'

তাই তো, ইদুঁরের ল্যাজে তো লোম থাকে না।

'এদের নিয়ে এবার কী করা যায়? এখানে ফেলে রাখলে হয় কাকে বা চিলে নিয়ে যাবে, নয়তো না খেয়েই এরা মরে যাবে।'

'ওদের মা হয়তো, জানেই না এরা এখানে পড়ে গেছে।' আমতা আমতা করে দাদা।

'শোন, দারুণ একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে।' জগুদা খুশিখুশি গলায় বলে, 'ওই কালুয়ার ঘরেই এদের ব্যবস্থা করতে হবে। কয়েকদিন ঠাম্মার সেবা যত্ন পেলেই ঠিক বেঁচে যাবে। খালি ঘরটা দেখে দিম্মার আর মনখারাপ হবে না।'

চারজনই ছুটতে ছুটতে ঠাম্মার কাছে হাজির হই। তিনি তখন বাড়ির টিন আর আচারের বয়াম রোদে দিতে ব্যস্ত।

হাতদুটো পেছনে লুকিয়ে জগুদা বলে, 'দিম্মা, চোখ বুজে হাত পাতো তো।'

'কেন রে?' অবাক হয়ে খানিকক্ষণ জগুদার দিকে তাকিয়ে থেকে খিলখিল করে হেসে ওঠেন ঠাম্মা, 'দুর পাগল ছেলে। আমি কি পেয়ারা খেতে পারি? দাঁত আছে?'

'হাত পাতোই না।' জগুদা নাছোড়বান্দা।

হাত পাতেন ঠাম্মা। চোখ বুজে। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রসারিত করতলের ওপর আ-স্তে করে ছানা দুটো নামিয়ে দিয়েছে জগুদা।

মুঠো করতে গিয়েই শিউরে উঠলেম ঠাম্মা। চোখ মেলতে মেলতেই তাঁর হাত থেকে ছানা দুটো শক্ত মেঝের ওপর থপাস করে পড়ে গেল।

'দিলে তো? মেরে ফেললে তো?' জগুদার আর্তচিৎকার। অপ্রস্তুত ঠাম্মা মেঝের দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠেন, 'ছি ছি একি অনাছিষ্টি কাণ্ড। ডাকাত ছেলে। কোত্থেকে ইঁদুর ছানা নিয়ে এসে একেবারে আমার হাতে? যাও যেখান থেকে এনেছ, সেখানেই রেখে এসো। কী বাঁদর ছেলে রে বাবা।'

'যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর?' জগুদার চোখ ছলছল করে, 'তোমার কথা ভেবেই তো, এত কষ্ট করে এদের নিয়ে এলাম।'

'হায় কপাল। আমার জন্য ইদুঁরের গর্ত থেকে তুমি ছানা চুরি করে এনেছ?'

'না গো দিম্মা, এগুলো ইদুঁর নয়— কাঠবিড়ালির ছানা।'

'কাঠবিড়ালির ছানা?' কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে ঠাম্মার চোখেও খুশির ঝিলিক। তাঁর পশুপাখির রাজত্বে নতুন সংযোজনের সম্ভাবনায় তিনি যথেষ্ট উত্তেজিত। 'কই দেখি দেখি।' জগুদা ততক্ষণে ছানা দুটোকে মেঝে থেকে তুলে ঠাম্মার জলচৌকির ওপর রেখেছে।

সন্তর্পণে হাত দিয়ে পরখ করে দেখে, সন্দেহ প্রকাশ করেন ঠাম্মা, 'অ্যাতো ছোটো। এগুলো বাঁচবে তো?'

'কেন বাঁচবে না শুনি? সেবার পালানদা যে টিয়াপাখির ছানাগুলো এনেছিল মনে নেই? সদ্য ডিম ফুটে বেরিয়েছে। চোখও ফোটেনি, একটা লোমও ছিল না গায়ে। কেমন ভয়ংকর, বকাসুরের ছানার মতো দেখতে। তারা এখনও দিব্যি বহাল তবিয়তে বেঁচেবর্তে আছে। কত বড়ো হয়েছে। কেমন সুন্দর হয়েছে দেখতে, বল। ওদের সবুজ মখমলের মতো পালক আর গলার লাল রঙের মালা, সবই তো তোমার হাতেই তৈরি। তুমি যে সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী, জগৎমাতা গো। তোমার হাতে কেউ মরতে পারে?'

প্রশংসায় কে না ভোলে। তারওপর ইনি তো আমাদের ঠাম্মা। নাতি-নাতনি আর পশুপাখি নিয়ে যিনি এক অপার্থিব আনন্দের জগতে বাস করেন। আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন, 'আশা করে, এত কষ্ট করে যখন তুলে এনেছিস, চেষ্টা তো করতেই হবে।'

ঠাম্মার পরিচালনায় আমরা চারজন এবার ওদের পরিচর্যায় লেগে যাই। বাটিতে দুধ নিয়ে কাপড়ের সলতে ভিজিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে খাওয়াই। তারপর কালুয়ার ঘরে খড়ের বিছানায় শুইয়ে দিই।

কল্পনাপ্রবণ মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জগুদার মাথাটাও ছিল দারুণ সক্রিয়। দুদিন পরই একটা নতুন পরিকল্পনা করে ফেলল সে।

'আচ্ছা সোনাই, আমরা যদি কোনওরকমে ওর মাকে এই ঘরের মধ্যে এনে ফেলতে পারি খুব ভালো হয় তাই না? ওদের যত্ন আত্তি করার ঝামেলা পোয়াতে হয় না।'

'সেটা কী করে সম্ভব?' হাঁ করে জগুদার দিকে তাকাই।

'সম্ভব নয় কেন?'

'আমরা কি বাগানের আমগাছে জামগাছে চড়ে ডালে ডালে ঘুরে একটা ধেড়ে কাঠবিড়ালি ধরে আনতে পারব? তাও হয়তো পারলাম। কিন্তু ওদের মা কোনটা, চিনব কী করে?' জানতে চায় দাদা।

'আরে, সেসব প্ল্যান ঠিক না করেই কি তোদের কাছে মুখ খুলেছি? দেখ না কী করি। তোরা শুধু কোনো আবোল তাবোল প্রশ্ন না করে আমার কাজে সাহায্য করে যাবি।'

আমি আর দাদা দুজনেই এক পায়ে খাড়া। যতই অবাসস্তব হোক, জগুদার ক্ষমতার ওপর আমাদের আস্থা আছে।

পরদিন দুপুরবেলা। মা ঠাম্মারা ভাইটুকে নিয়ে ঠাম্মার বড়োখাটে শুয়ে পড়েছে। জগুদার নির্দেশমত আমি দা ঠাম্মার নিরামিষ রান্নাঘরে উপস্থিত হই। কালুয়ার ঘরটা এই ঘরের মুখোমুখি। দশ-বারো হাত দূরে।

এবার পকেট থেকে দুটো শাড়ির পাড় বের করল জগুদা। সে দুটো গিঁট দিয়ে জুড়ে বেশ লম্বা একটা দড়ি বানাল। তার একপ্রান্ত কালুয়ার ঘরের টিনের দরজার গায়ে একটা ভাঙা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে বেশ ভালো করে বেঁধে দিল। আর এক প্রান্ত ধরে দরজার সামনে বসে পড়ল, ছিপ হাতে মাছ ধরতে বসার কায়দায়। দরজাটা আধ-ভেজানো রইল।

টিনের দরজাটা খোলাই আছে। ছানাগুলোর মা ঘরে ঢুকলেই জগুদা দড়ি ধরে টান দেবে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।

দশ পনেরো মিনিট ধৈর্য ধরে বসে থাকার পর আর পারলাম না। জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'আচ্ছা জগুদা, ওদের মা কী করে জানবে যে ছানাগুলো ওই ঘরেই আছে। ওকে কে বলে দেবে?'

'তোদের সবচেয়ে বড়ো দোষ কী জানিস? সবসময় নিজের বুদ্ধি দিয়েই অন্যের বুদ্ধিকে যাচাই করিস।' চাপাগলায় ধমকে উঠল জগুদা।

পরক্ষণেই আমার কাঁদো কাঁদো মুখের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আরে, আরে কী হল? কেঁদে ফেলবি নাকি? ওহো আমারই ভুল হয়েছে। প্রথমেই সবকিছু খুলে বলা উচিত ছিল।'

'আচ্ছা শোন। প্রথম দিন ওদের দুধ খাইয়ে ঘরের ভেতর শুইয়ে রেখেই তো কেটে পড়লি। আমার মনটা কিন্তু খচ্‌খচ্ করতে লাগল। একটা কথা বারবার মনে পড়ছিল। ওদের যখন তুলে আনি, পাশের আমগাছের ওপর থেকে একটা কিচকিচ শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। শব্দটা কেমন জানিস?

'গতবছর সরস্বতী পুজোর দিন পল্লবকে বাড়ির সামনেই একটা ট্যাক্সি ঠেলা মেরে ফেলে দেয়। সবাই মিলে ধরাধরি করে রিক্সায় তুলে ওকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি, কাকিমা— মনে পল্লবের মায়ের— গলা থেকে এমনই একটা অদ্ভুত অর্থহীন চিৎকার বেরিয়ে এল। সেটা কষ্ট, রাগ, ভয় না অভিশাপ আমি বুঝতে পারিনি। তিরের ফলার মত শব্দটা বুকের মধ্যে বিঁধে গেল।

হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে পল্লব যেদিন বাড়ি ফিরল, কাকিমার সেদিনকার আলোমাখা মিষ্টিমুখটা আমি জীবনে কোনোদিনই ভুলতে পারব না। ছানাগুলোকে ঘরের মধ্যে রেখে একটুও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। ওদের আবার সেই গাছের তলায় রেখে আসার কথাও ভেবেছিলাম একবার।'

'তারপর?'

'তারপর, পরশুদিন কী দেখলাম জানিস? সেও এক অপূর্ব দৃশ্য। তখন দুপুরবেলা। একটা ধেড়ে কাঠবিড়ালি পাঁচিল বেয়ে সুড়ুৎ করে নেমে এসে কালুয়ার ঘরের সামনে থমকে দাঁড়াল। এদিক সেদিক চেয়ে সামনের পা দিয়ে দরজায় আঁচড় কাটতে লাগল। মুখে কিচ্‌কিচ্ শব্দ।

ভেতর থেকে ছানাগুলো চিঁ চিঁ করে সাড়া দিচ্ছে। দরজাটা খুলে রাখিনি বলে দারুণ আপসোস হচ্ছিল'।

'এসব কথা আমাদের আগে বলনি কেন?' দাদা জিজ্ঞেস করে।

'আগে বললে তো তোরা সারাদিন ওই ঘরের সামনেই ঘুরঘুর করতিস। ওদের মা ভয়ে আর এদিক মাড়াত না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ সে আবার আসবে। আমাদের ফাঁদে ধরা দেবে। কাল আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে লক্ষ করতে পারিনি। হয়তো কালও এসেছিল।'

জগুদার ওপর আমাদের ভক্তিটা বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। ভেজানো দরজার সরু ফাঁক টুকু দিয়ে তিনজোড়া চোখ অপলক চেয়ে আছে। নিঃশব্দে জগুদার হাতে দড়িটা শক্ত করে ধরা। তার মাথার ওপর উপুড় হয়ে আমি। আমার মাথার ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দাদা। আমাদের বুকের ধুকপুকুনির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে জগুদার হাতঘড়িটা।

তখন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক চারটে। পাচিলের পাশের ডালিম গাছের গা বেয়ে একটা কাঠবেড়ালি সড়সড় করে নেমে কালুয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড এদিক সেদিক চেয়েই

ঢুকে করে ভেতরে ঢুকে গেল। সেই কয়েক সেকেন্ড আমাদের বুকের শব্দও বুঝি থেমে গিয়েছিল। সম্বিত ফিরতেই দেখি দড়ির হ্যাঁচকা টানে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে জগুদা।

আমি আর দাদা কালুয়ার ঘরের দিকে ছুট লাগালাম। পেছনে পেছন সেই লম্বা দড়িটাকে রুটি বেলার বেলনের সঙ্গে জড়াতে জড়াতে ধীরে সুস্থে এগিয়ে আসছে জগুদা।

তিনজনই ভেবেছিলাম, মা কাঠবিড়ালি এবার বাইরে বেরোনোর জন্য দরজা ধাক্কাতে শুরু করবে। কিন্তু পাক্কা তিন মিনিট কেটে গেল। তার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

আমাদের এই অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি শুনে সন্ধেবেলা ঠাম্মা পাটিশাপ্টা বানাতে বসে গেলেন।

পরদিন ভোরে টিনের দরজাটা ফাঁক করে দেখেই হাহাকার করে উঠল জগুদা। ছানাদুটো খড়ের বিছানায় দিব্যি শুয়ে আছে, কিন্তু তাদের মাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমাদের সব পরিশ্রম ব্যর্থ করে সে চলে গেছে।

'কোন দিক দিয়ে বেরলো বল তো? ভালো করে দরজা বন্ধ করে দড়িটা দেওয়ালের পেরেকের সঙ্গে শক্ত করে যেমন বেঁধে দিয়েছিলাম তেমনিই বন্ধ আছে। জানলাও তো নেই। শুধু একটা ঘুলঘুলি।'

কালুয়ার ঘটনার পর তার ঘরের দেওয়ালে একটা পেরেক পুঁতে, দেওয়া হয়েছে টিনের দরজায় একটা ফুটো করে দড়ি বাঁধা হয়েছে। দরজা বন্ধ করে দড়িটা পেরেকের সঙ্গে বেঁধে দিলে ভেতর থেকে খোলার কোন সম্ভাবনা নেই।

জগুদার কথা শেষ হতে না হতেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মা কাঠবিড়ালি ছুটে এসে দেওয়ালের গা বেয়ে উঠে ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

তারপর থেকে দরজাটা সবসময় খোলাই রাখা হয়। মা কাঠবিড়ালির সঙ্গে বাবা, কাকা, মাসি, পিসি, ঠাকুমা, দিদিমা কাঠবিড়ালিরাও আসে। বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে ওদের খড়ের বিছানায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যায়। কেউ কেউ ওদের খাবারে ভাগও বসায়। কেউ আবার ওদের জন্য আধ খাওয়া পেয়ারা বা জামরুল মুখে করে নিয়ে আসে।

গোয়ালা রামবিলাস ওদের দুজনকে নামকরণ করল, 'রামভজন' আর 'রামপুজন'। তিন চার মাসের মধ্যেই ওরা এত বড়ো হয়ে গেল যে, বাবা মা মাসি পিসিদের সঙ্গে ওদের আর আলাদা করে চেনাই কঠিন হয়ে পড়ল।

নাম ধরে ডাক দিলে একদঙ্গল কাঠবিড়ালির ভেতর থেকে দুজন ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে তির্‌তির্‌ করে ল্যাজ কাঁপাতে থাকে। এভাবেই আমরা ওদের চিনি।

মুঠো-মুঠো বাদাম ওদের সামনে ছড়িয়ে দিই। পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনে পা দুটো দিয়ে হাতের মতো ধরে একটা একটা করে বাদাম দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খায়। সেইভাবেই কমলালেবুর কোয়ার মাঝখানটা চিড়ে রসালো দানা বার করে চুষতে থাকে। আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি।

ঠাম্মা পুজোর ঘরে আহ্নিক করতে বসলে উমনো ঝুমনো আসনের সামনে পেখম মেলে নাচে। ময়ূর দুটোর

ওই নাম আদর করে মা-ই রেখেছিল। বাগানে কচি ঘাস খেতে খেতে হরিয়া অকারণে সামনের দুপা তুলে লাফিয়ে ওঠে। ভোরবেলা খাঁচার পাখিরা নানাসুরে গান গায়। কেউ কেউ আমাদের নাম ধরে ডাকে। উঠোন জুড়ে কাঠবিড়ালিরা ছুটে বেড়ায়। সন্ধেবেলা কোমর দুলিয়ে হাসেরা ঘরে ঢোকে। প্রাণের ছন্দ ভরা সেই আনন্দমেলায় আমরা তিন ভাইবোন তরতর করে বেড়ে উঠছি।

অধিকাংশ পশুপাখির আয়ুই মানুষের চাইতে কম। কৈশোরের প্রান্তে এসে দেখি, খালি খাঁচা আর দাঁড়ের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

ঠাম্মার শরীরও দিন দিন ভেঙে পড়েছে। নতুন নতুন পশুপাখি সংগ্রহের দিকে তাঁর আর তেমন মন নেই। স্কুল কলেজ, খেলাধুলো, গান বাজনা ছাড়াও আমরা নানা কাজে ও অকাজে জড়িয়ে পড়ছি।

কবে থেকে সন্ধেবেলা আর রূপকথা শোনানোর জন্য ডাক দেন না ঠাম্মা, আমরা খেয়ালও করিনি। কবে থেকে নিজের হাতে তাঁর ময়না, টিয়াদের ছোলা খাওয়ান না, লক্ষই করিনি। যেমন করে তাঁর ভরা সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের নিয়ে খেলাঘর পেতেছিলেন, তেমনি করেই সকলের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে থাকেন। নতুন এক জগৎ বুঝি তাঁকে ডাক দিয়েছে।

হঠাৎই একদিন বাবাকে বললেন, 'আমি না থাকলে পাখিগুলোকে আর বাড়িতে রেখে দরকার নেই। খাঁচা খুলে দিস। উড়ে চলে যাবে। হরিয়া আর উমনো ঝুমনোকে পারিস তো কোনো বনে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসিস

'তুমি কোথায় যাবে মা? সেকদিন তোমার বৌমাই ওদের দেখাশোনা করতে পারবে। কোনো চিন্তা করো না

মুচকি হেসে ঠাম্মা বলেছিলেন, 'না রে, কারও জন্যই আর কোন চিন্তা নেই আমার।'

এর কয়েকটা দিন পরই মাত্র তিনদিনের জ্বরে ভুগে আমাদের সকলকে ছেড়ে ঠাম্মা এক অজানা জগতের দিকে পাড়ি দিলেন। আমাদের আলো ঝলমল পৃথিবীটা এক মুহূর্তেই যেন গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল।

চোখের জল মুছতে মুছতে পাখির খাঁচার দরজাগুলো খুলে দিলেন মা। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, বাইরে বেরিয়ে পাখিরা কেউ উড়ে চলে গেল না। ঠাম্মার খাটের চারপাশ ঘিরে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠাম্মার শ্মশানযাত্রায় হরিয়া, উমনো ঝুমনো, মিধু, রিধু, মনু, সনু ইত্যাদি নামের টিয়া ও ময়নারা সবাই সামি হয়েছিল। রামভজন আর রামপুজন তাদের মা, বাবা, আত্মীয়স্বজন সকলকে নিয়ে তরতরিয়ে ছুটে চলেছিল। এমন অভিনব শোভাযাত্রা কেউ কোনোদিন দেখেনি।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, বাবা কাকাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে এসে তারা যে যার খাঁচা বা ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। সে খাঁচা যে শুধু লোহার কারাগার নয়, ঠাম্মার যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে গড়া নিরাপদ আশ্রয়, তারা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল।

সেদিন একবিন্দু জলও কেউ মুখে তোলেনি। তাদের এই নীরব শোকপালনের মাধুর্য আমাদের স্নেহময়ী, আনন্দময়ী ঠাম্মাকে যে এক অনন্ত অক্ষয় শান্তির পারাবারের পথেই এগিয়ে দিয়েছিল, এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সংশয় নেই।

ছবি : অনুপ রায়

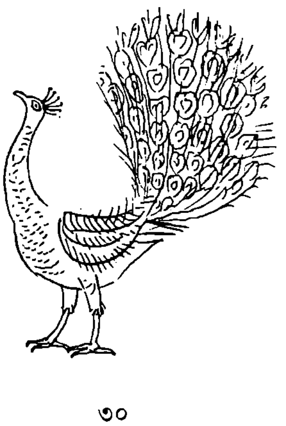

কল্পনা ও ছবি – গৌতম কর্মকার
কমান্ডার বোস
আমি কমান্ডার দুর্জয় বোস। আমার সহকারী উইলিয়াম মার্লো এবং এডগার এমারসন। ইন্টারন্যাশনাল স্পেস অ্যাসেম্বলীর সর্বাধুনিক মহাকাশযান 'ফ্রেন্ডশিপে' চড়ে আমরা পাড়ি দিয়েছি অনন্ত মহাবিশ্বে।
পড়ে নাও ত্রয়োবিংশ শতাব্দীর দুর্দান্ত মহাকাশ অভিযান
মানুষের বাসযোগ্য দ্বিতীয় একটি পৃথিবী আমাদের কাম্য। নিছক ঔপনিবেশিকতা নয়, পৃথিবীর মানুষের উষ্ণ সৌহার্দ্য মহাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।
স্যার আপনাকে ভীষন ইমোশন্যাল দেখাচ্ছে! কী ভাবছেন?
তেমন কিছু নয় মার্লো।

'ইনসা'– ইন্টার ন্যাশনাল স্পেস অ্যাসেম্বলী।
FRIEND SHIP
অন্ধকার মহাবিশ্বের ছবি দেখতে দেখতে আমরাও একসময় যান্ত্রিক হয়ে যাবো। তখন আবেগ-টাবেগ থাকবে না!
আমি তোমার সাথে একমত
পারলাম না মার্লো। আমরা
মাংসের মানুষ, 'স্ফিংস' নই
মানুষের স্বাভাবিক ধর্মগুলো কখনোই নষ্ট হবে না।
স্যর, বলুন কি ভাবছিলেন?
ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। আমার বাবা ছিলেন স্পেস-ইঞ্জিনিয়ার
শিশু বয়সে তিনি আমার মনে মহাবিশ্বের ছবি এঁকে দিয়েছিলেন।
ছেলেবেলা থেকেই আপনি মহাবিশ্বে পাড়ি দেবার স্বপ্ন দেখতেন?
হ্যাঁ, দেখতাম।
তখন সবে
দিয়েছি। চাঁদে
স্পেস-স্টেশন
উঠছিল। বাবা
বাবা, আমি
সাথে চাঁদে
মাঝে মাঝে ছুটিতে বাবা পৃথিবীতে আসতেন। প্রতিবার আমি চাঁদে যাবার ঝোঁক ধরতাম। বাবা বলতেন সময় হলে ঠিক নিয়ে যাবেন। তারপর একবার সত্যিই সুযোগ এল।
দুর্জয় কাল তোকে নিয়ে যাবো।
হুররে কী মজা!

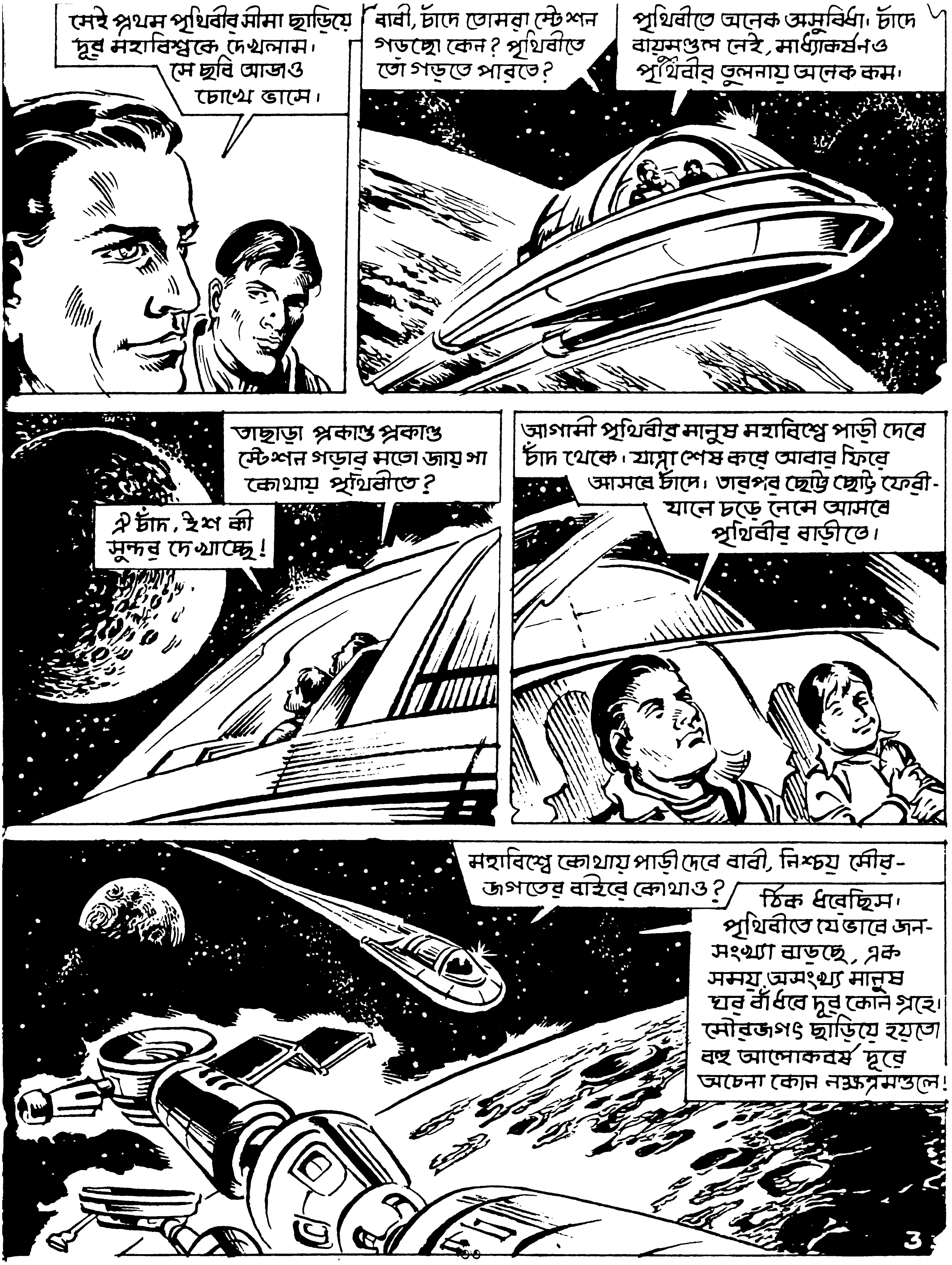
সেই প্রথম পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে দূর মহাবিশ্বকে দেখলাম। সে ছবি আজও চোখে ভাসে।
বাবী, চাঁদে তোমরা স্টেশন গড়ছো কেন? পৃথিবীতে তো গড়তে পারতে?
পৃথিবীতে অনেক অসুবিধা। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই, মাধ্যাকর্ষণও পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম।
তাছাড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্টেশন গড়ার মতো জায়গা কোথায় পৃথিবীতে?
ঐ চাঁদ, ইশ কী সুন্দর দেখাচ্ছে!
আগামী পৃথিবীর মানুষ মহাবিশ্বে পাড়ী দেবে চাঁদ থেকে। যাত্রা শেষ করে আবার ফিরে আসবে চাঁদে। তারপর ছোট্ট ছোট্ট ফেরী-যানে চড়ে নেমে আসবে পৃথিবীর বাড়ীতে।
মহাবিশ্বে কোথায় পাড়ী দেবে বাবী, নিশ্চয় সৌর-জগতের বাইরে কোথাও?
ঠিক ধরেছিস। পৃথিবীতে যে ভাবে জন-সংখ্যা বাড়ছে, এক সময় অসংখ্য মানুষ ঘর বাঁধবে দূর কোন গ্রহে। সৌরজগৎ ছাড়িয়ে হয়তো বহু আলোকবর্ষ দূরে অচেনা কোন নক্ষত্রমণ্ডলে!

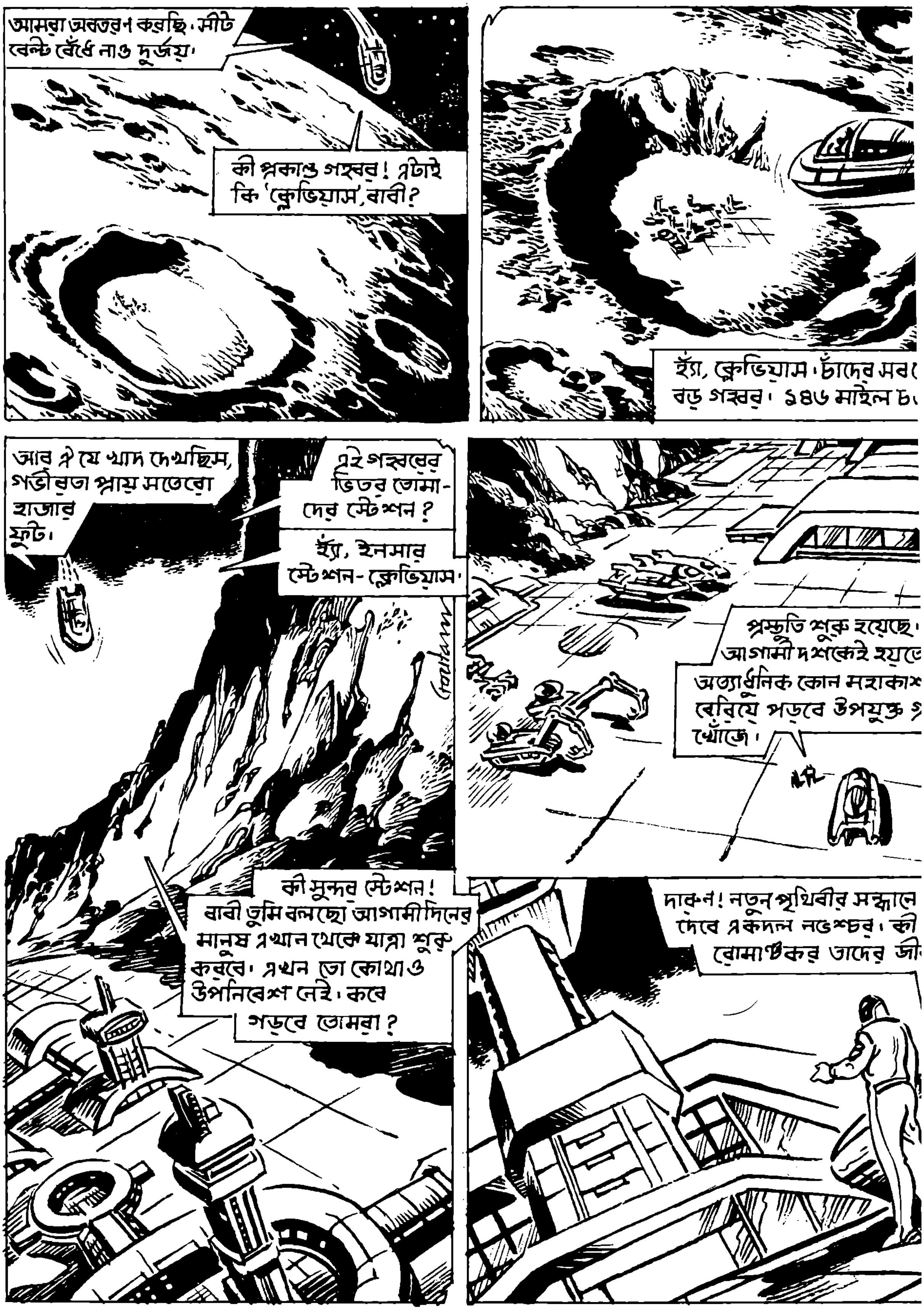
আমরা অবতরণ করছি। সীট বেল্ট বেঁধে নাও দুর্জয়।
কী প্রকাণ্ড গহ্বর! এটাই কি 'ক্লেভিয়াস', বাবী?
হ্যাঁ, ক্লেভিয়াস। চাঁদের সব
বড় গহ্বর। ১৪৬ মাইল চ
আর ঐ যে খাদ দেখছিস, গভীরতা প্রায় সতেরো হাজার ফুট।
এই গহ্বরের ভিতর তোমাদের স্টেশন?
হ্যাঁ, ইনসার স্টেশন-ক্লেভিয়াস।
প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।
আগামী দশকেই হয়
অত্যাধুনিক কোন মহাকাশ
বেরিয়ে পড়বে উপযুক্ত
খোঁজে।
কী সুন্দর স্টেশন! বাবী তুমি বলছো আগামীদিনের মানুষ এখান থেকে যাত্রা শুরু করবে। এখন তো কোথাও উপনিবেশ নেই। কবে গড়বে তোমরা?
দারুণ! নতুন পৃথিবীর সন্ধানে
দেবে একদল নভশ্চর। কী
রোমাঞ্চকর তাদের জী

বিজ্ঞানীদের জীবনপাতা থেকে

অমরনাথ রায়

প্রতি রাতের মতো সে রাতেও তিনি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আকাশ পর্যবেক্ষণে তিনি এতই মগ্ন ছিলেন যে সে রাতে রাস্তার একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। তার ফলে হাঁটুতে তাঁর জোর আঘাত লেগেছিল।

এক বৃদ্ধা মহিলা দেখতে পেয়ে তাঁকে গর্তের মধ্যে থেকে টেনে তুলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি কে হে বাপু'? —উত্তরে আহত ব্যক্তিটি বলেছিলেন, 'আমি একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করছিলাম।' বৃদ্ধা তাই শুনে মন্তব্য করেছিলেন, 'মিথ্যুক কোথাকার। পায়ের তলার মাটি যে দেখতে পায় না, সে কিনা আবার আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করে।'

থেলস্

বল দেখি, লোকটি কে?

—উনি হলেন বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'থেলস'। মিলেটাস এর 'থেলস্'।

লন্ডনের পুটনে হাসপাতাল।

সেখানে এক তরুণ গণিতশাস্ত্রবিদ চিকিৎসার জন্যে সম্প্রতি ভর্তি হয়েছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক হার্ডিসাহেব একদিন ঐ রোগীকে দেখতে এসেছেন। যে মোটর গাড়িতে চড়ে তিনি এসেছেন তার নম্বর ১৭২৯।

হার্ডি কথায় কথায় রোগীকে শুধালেন, 'আমার গাড়ির নম্বরে কোন বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছেন কী? আমার তো মনে হয় ঐ সংখ্যাটিতে কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই।' —রোগী চটপট উত্তর দেন, 'আপনার অনুমান ঠিক নয় অধ্যাপক হার্ডি। সংখ্যাটি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। কারণ ঐ সংখ্যাটিকে দু'ভাবে দুটি ত্রিঘাত যোগফলের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায়। এ ভিন্ন সংখ্যারাজ্যে ঐ সংখ্যাটিই তরুণতম।' —এই বলে মুখে মুখেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন তাঁর বক্তব্যের সত্যতা। আর অধ্যাপক হার্ডি অবাক হয়ে গেলেন গণিতের এই জাদুকরের বক্তব্যের প্রমাণ পেয়ে।

রামানুজন

বলতে পার— গণিতের এই জাদুকরটি কে? ইনি হলেন বিখ্যাত ভারতীয় গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজন। ইনিই প্রথম ভারতীয় যিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সুইডেনের 'স্টকহোম কনজারভেটারি হল।' অনুষ্ঠান শুরু হবার আগেই হলটিতে তিল ধরনের স্থান নেই।

কিন্তু কেন?

—কারণ ১৯৫২ সালে চিকিৎসা ও শরীরবিদ্যা বিষয়ে নোবেলজয়ী এক বিজ্ঞানীকে ওই দিন ওই হলে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হবে। পুরস্কার দেবেন সুইডেনের রাজা 'গুস্তাভ'।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে বিজ্ঞানী পুরস্কার গ্রহণ করলেন। অগণিত দর্শক হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করলো। তারপর তাঁকে অভিনন্দিত করতে এগিয়ে এল পাঁচ বছর বয়সের একটি মেয়ে। হাতে তার পাঁচটি লাল গোলাপের একটি স্তবক। মেয়েটি সেই পুষ্পস্তবক উপহার দিল বিজ্ঞানীকে।

আবার অগণিত দর্শকের করতালিতে, মুখর হয়ে উঠল হলঘরটি। উপহার গ্রহণ করে বিজ্ঞানী বললেন, 'এই উপহারটিকে আমি নোবেল পুরস্কারের চেয়েও বেশি সম্মানজনক বলে মনে করি। কারণ পাঁচ বছর আগে আমার আবিষ্কৃত ওষুধ খাওয়ার ফলেই এই মেয়েটির জীবন রক্ষা পায়। এর উপহার দেওয়া পাঁচটি গোলাপ, মেয়েটির রোগমুক্ত জীবনের পাঁচটি বছরের স্মারক চিহ্ন এবং আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান।'

বলতে পার— কে এই বিজ্ঞানী?

ইনি হলেন 'স্ট্রেপটোমাইসিন' নামক অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কর্তা ডক্টর সেলমন আব্রাহাম ওয়াক্সম্যান।

১৯২৩ সাল। বম্বে-থানে রেলপথের 'দোমবিভলি' স্টেশনে একটি লোকাল ট্রেনে উঠবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন এক ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ববিদ। তাঁর ট্রেনের টিকিটে যে নম্বরটি ছাপা ছিল সেটির কোন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, তাই ভাবছিলেন।

সামনের লাইন দিয়ে একটা মালগাড়ি ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল। আর ঐ ভদ্রলোক মালগাড়িটির বিভিন্ন ওয়াগনের গায়ে লেখা নম্বরগুলি একটি কাগজে টুকে রাখছিলেন।

ইতিমধ্যে লোকাল ট্রেনটি এসে গেল এবং উনি তাতে উঠে পড়ে চলে গেলেন গন্তব্যস্থলে। বাড়িতে পৌঁছে অবসর সময়ে রেলের টিকিট ও ওয়াগনগুলির নম্বরের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কিনা তা নিয়ে ভাবতে বসলেন। আর এই চিন্তা ভাবনা করতে করতেই একদিন তিনি এক বিশেষ ধরনের সংখ্যা আবিষ্কার করে ফেললেন এবং আবিষ্কৃত সংখ্যার নাম দিলেন 'ডেমলো নাম্বার' বা 'ডেমলো সংখ্যা'।

ডেমলো সংখ্যা কিরকম তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ৭৯৯৯২ একটি 'ডেমলো সংখ্যা'। এর প্রথম অঙ্ক ৭ এবং শেষের অঙ্ক ২। এই ৭ আর ২ যোগ করলে পাওয়া যায় ৯ অঙ্কটি। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই ৯ অঙ্কটি ডেমলো সংখ্যা ৭৯৯৯২ এর মধ্যেকার অংশে তিনবার পরপর স্থান পেয়েছে।

আবার ৫৮৮৮৮৩ একটি ডেমলো সংখ্যা। কারণ, এর প্রথম অঙ্ক ৫ এবং শেষ অঙ্ক ও এর যোগফল হচ্ছে ৮ আর এই ৮ অঙ্কটি ৫৮৮৮৮৩ ডেমলো সংখ্যার মাঝে চারবার পরপর স্থান পেয়েছে।

যে গণিতজ্ঞের কথা বলছি তিনি পেশায় ছিলেন গণিত শিক্ষক। সংখ্যা নিয়ে খেলার ছলে তিনি ছাত্রদের অঙ্ক শেখাতেন। ফলে অঙ্কশাস্ত্র ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতো।

বলতে পার— এঁর নাম কি?

—ইনি হলেন দত্তাত্রেয় রামচন্দ্র কাপরেকর। সংক্ষেপে ডি. আর কাপরেকর। ১৯০৫ সালের মুম্বাই এর কাছে দাহানুতে এঁর জন্ম। আর মৃত্যু হয় ১৯৮৮ সালে দেবলালিতে।

মিলিকান

১৯২৩ সালে এক আমেরিকান বিজ্ঞানী পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। একদিন তিনি তাঁর বাড়িতে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে রাত্রিকালীন আহারের জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আয়োজন সম্পূর্ণই ছিল। কিন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী এক বিখ্যাত পরীক্ষা নিরীক্ষায় সেদিন খুব ব্যস্ত ছিলেন। সন্ধে হতে না হতেই তার মনে পড়ে গেল যে রাত্রে আহারের জন্যে তিনি বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।— এটা মনে হওয়া মাত্রই তিনি ল্যাবরেটরি থেকে তাঁর স্ত্রীকে টেলিফোন করে জানালেন 'এখন আমি একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি, তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাব।'

অতিথিরা যথাসময়ে বিজ্ঞানীর বাড়িতে হাজির

হলেন। বিজ্ঞানীর স্ত্রী তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসালেন। তারপর বললেন, 'খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমার স্বামীর আজ বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হবে। তিনি ফোন করে আমাকে জানিয়েছেন যে ল্যাবরেটরিতে তিনি কাপড় কাচা ও ও তা ইস্ত্রি করার কাজে খুব ব্যস্ত আছেন। তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাড়ি ফিরবেন।'

সমবেত অতিথিরা এ কথা শুনে মুখে কিছুই বললেন না। কেবল একটুখানি মুচকি হাসলেন। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'ধান শুনতে কান শোনা।' —এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। বিজ্ঞানী পত্নী ধান শুনতে কান শুনেছিলেন।

বলতে পার কে এই নোবেলজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী? ইনি হলেন রবার্ট অ্যানড্রুজ মিলিকান; যিনি ইলেকট্রনের আধান নির্ণয় করেছিলেন এবং ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের উপর গবেষণা করে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

এডিসন

১৮৭৮ সালের মার্চ মাস। মেনলো পার্কের বীক্ষণাগারে বিজলি উদ্ভাবনের সাধনায় মগ্ন ছিলেন এক বিজ্ঞানী। এই বিজ্ঞানী জানতেন যে বৈদ্যুতিক রোধ থেকে সৃষ্টি হয় আলো। আবার এ থেকে তাপও সৃষ্টি হয়। কাজেই রোধকে এমন সাবধানে রাখতে হবে, যাতে রোধের তার পুড়ে না যায়।

এই ভেবেই যন্ত্রবিদ বিজ্ঞানী খুব সরু তারের একটি কুণ্ডলী বা ফিলামেন্ট তৈরি করলেন। সরু তারের রোধ হয় বেশি। বিদ্যুৎ চালনার সঙ্গে সঙ্গে ফিলামেন্ট জ্বলতে থাকে। ছড়াতে থাকে উজ্জ্বল আলো।

কিন্তু এ আলো বেশিক্ষণ পাওয়া গেল না। একটু বাদেই ফিলামেন্ট গরম হয়ে ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলোও গেল নিভে।

ফিলামেন্ট তৈরির উপযুক্ত পদার্থ খুঁজে পাওয়ার জন্যে বিজ্ঞানী নিত্য নতুন পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। নানা ধাতুর তার, বাঁশের তন্তু, মানুষের মাথার চুল, কাগজ, তুলোর সুতো— কোন কিছু নিয়েই পরীক্ষা করতে বাকি রাখলেন না।

এই সময় এক বন্ধু ঠাট্টা করে একদিন বললেন, 'বন্ধু, তুমি তো হাজারখানেক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করেও বিজলি বাতি এখনও তৈরি করতে পারলে না। তোমার লজ্জা হয় না?'

উত্তরে বিজ্ঞানী বলেছিলেন, 'কিন্তু ভাই, আমি তো হাজারটি এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি যাতে বিদ্যুৎ হতে আলো পাওয়া যায় না। সেটা কি আমার কৃতিত্ব নয়? তবে আমার লজ্জা হবে কেন?'

যেমন প্রশ্ন, তেমনি জবাব।

বন্ধুটি তখন চুপ করে গেলেন।

বলতে পার— কে এই বিজ্ঞানী?

ইনি হলেন টমাস আলভা এডিসন। বৈদ্যুতিক বাল্বের উদ্ভাবক।

আমার গ্রাম বদলে যায়

সৌমিক সরকার

গ্রাহক সংখ্যা ৩৯৪০, বয়স : ১৩ বছর

গাছ-গাছালির মাঝে ছাওয়া
তুলসীতলা, নিকোনো দাওয়া
ছেলে-মেয়ের নদীতে নাওয়া
নদীর বুকে নৌকো বাওয়া

ভাটিয়ালির সুরে গাওয়া
মাঝির গান স্নিগ্ধ হাওয়া
কথকতা শুনতে চাওয়া
যাত্রা-নাটক দেখতে পাওয়া
রাঙামাটির পথে যাওয়া
পোষ-পাবনে পিঠে খাওয়া

এসব নিয়েই আমার গ্রাম
আম-কাঁঠাল আর জারুল-জাম।

বোকা বাঘ ও চালাক মেয়ে

রিখিয়া ভুক্ত

গ্রাহক সংখ্যা ৪০৯৫, বয়স ৬ বছর

একটা বাঘ পুকুরে জল খেতে গিয়ে দেখে ওর গা ডোরাকাটা ডোরাকাটা দাগ। সেই সময়ে বাঘটা দে কী একটা শব্দ আসছে কোথা থেকে। পেছন ফিরে দে একটা মেয়ে স্নান করতে আসছে। বাঘ তখন মেয়েটা বলল, 'আমার গায়ের দাগগুলো তুলে দে তো'। মেয়ে ভয় পেয়ে গেল। তখন মেয়েটা বাঘটাকে বল 'আমার সাবান ফুরিয়ে গেছে তুমি একটু বোস আ সাবান নিয়ে আসছি'। তারপর মেয়েটা সাবান আন চলল। যখন দেখল যে সে অনেক দূরে চলে এসে বাঘকে আর দেখা যাচ্ছে না, তখন দে ছুট।

ভয়ংকর নরসুন্দর

সন্দীপন পারেখ

গ্রাহক সংখ্যা ৯৯৭, বয়স : ১৪ বছর

আমি নিজেকে একজন বেশ সাহসী ছেলে মনে করি। তা নিয়ে কিছু গর্বও করি। ভূতে ভয় পাই না, অন্ধকারে না, পোকা-মাকড়েও না। কিন্তু কেবল একটা জিনিসকে আমি প্রচণ্ড ভয় পাই। সেটা হল নাপিতের কাঁচি।

সেদিন মাসের প্রথম রবিবার। নিয়ম অনুযায়ী চুল কাটার দিন। কোনওরকমে গত চার মাস ধরে নানান ফন্দি-ফিকিরে নিজের চুলগুলো অক্ষত রেখেছি। কিন্তু এখন এত বড় হয়ে গেছে যে আর না কাটলেই নয়! আর এত বার পালিয়ে গেছি, যে এবার আর বাবাকে ভোলানো যাবে না। দুরু দুরু বুকে সেলুনে ঢুকলাম। 'কি চুল ছাঁটবেন?' বলে বাঁজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠল নাপিতটি। আমি ভাবলাম সময় থাকতে পালাই। কিন্তু তার জো নেই কারণ, বাবা আমার হাত চেপে দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ারে বসলাম। নাপিতটি একটি সাদা কাপড় এমন ভাবে বেঁধে দিল যে আমার মনে হল প্রথমেই আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিল। সামনে দেখি টেবিলের ওপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর অতাচার চালাবার নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। আবার বড় বড় আয়না লাগিয়ে রেখেছে যাতে আমরা সেটাকে সব দিক থেকে স্বচক্ষে দেখতে পারি। ইঃ! কী নিষ্ঠুর! নাপিতরা কী অমানুষ! তারপরেই নাপিতটি আমার নাকে, কানে, মুখে জল ছিটিয়ে কাজ আরম্ভ করল। খালি খ্যাচ্-খ্যাচ্ করে চুল কাটে আর ঢং করে জিজ্ঞেস করে 'ঠিক আছে তো খোকাবাবু?'। আমার উত্তর দেবার অবস্থা থাকে না। আমি চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে প্রার্থনা করি, 'হে ভগবান, কোনও অলৌকিক ঘটনায় এক্ষুনি এ অত্যাচার বন্ধ করো। পরক্ষণেই নাপিতের এক এলোপাথাড়ি খোঁচায় ও বিপুল টানে আমি আঁতকে উঠি। চোখ খুলে যায় ও দেখি আমার অত প্রিয় আধা-সোনালি আধা-খয়েরি কেশগুচ্ছ আমার কোলের সেই সাদা কাপড়ের ওপর পড়ে আছে। কিরকম দয়া-মায়াহীন ভাবে কোনও দ্বিধা না করে খচ্-খচ্ শব্দে দ্রুত গতিতে কাঁচি চালিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে চলেছে নাপিতটা। 'আহ!' বলে চেচিয়ে উঠলাম! কানের পাশে ও জুলপিতে বুঝি চুলের সঙ্গে চামড়াও কাটা পড়ল। আমি ভাবি এই বার বুঝি কানটাও গেল।

সত্যিই, নাপিতগুলি অতি নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী লোক। আমার পছন্দ নয়। হবার কথাও নয়, ওরকম লোক কখনও ভালো হতে পারে? বাবার চুল কাটতে হলে বুঝি এরকম করত? আমাকে বাচ্চা পেয়ে এইসব হচ্ছে। আমিও দেখে নেব। বাবাও না, কিচ্ছু বোঝে না। বুঝতে কি পারছে না যে কী বাজে কাটছে নাপিতটা আর আমার কত লাগছে! নাকি বুঝেও চুপ করে আছে! নাপিতের কাছে এরকম কষ্ট পাওয়ার চেয়ে চুল বড় রেখে গরম সহ্য করা ঢের ভালো। হঠাৎ দেখি সেই মারাত্মক ছুরিটা বের করছে নাপিতটা। 'এই সেরেছে।' আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। ছুরির জ্বালায় আমি আবার প্রায় চেঁচিয়ে ফেলেছিলাম, বাবা কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে দেখে সেই আর্তনাদ আর গলা দিয়ে বেরোল না। তবে আমার নাপিতের ভয় দ্বিগুণ বেড়ে গেল। যতবার ছুরি ঠেকাচ্ছে আমি শিউরে উঠছি। নাপিতটা বলে 'খোকাবাবু, ছট্‌ফট্ করো কেন? দেখুন তো, সেই শুরু থেকে ও হাত-পা ছুঁড়ছে। শান্ত হয়ে বসো, খোকাবাবু। ছট্‌ফট্ করে না।'

অত্যাচার শেষ হয়েছে। আর আমি প্রায় নেড়া হয়ে গেছি! সেকি, এমন তো কথা ছিল না! নাপিতটা আবার মুখ খুলল, 'খোকাবাবু, ঠিক আছে? অরো চুল ছাঁটব?' কী শয়তান লোক! আমার প্রায় পুরো মাথা থেকে চুল সাফ করে এখনও সাধ মেটেনি! কোনও মায়া বোধ নেই কী? আরেকবার কাঁচি ধরলে মনে হয় একেবারে মাথার খুলি চেঁচে সোজা স্বর্গে পাঠিয়ে তবে ছাড়বে। এই তালেই ছিল শুরু থেকে, শুধু বাবার জন্য পারেনি। কিন্তু এখন কত মাত্রায় সাহস বেড়ে গেছে! আমি আর কোনোদিন নাপিতের সেলুনে ঢুকব না। বাবা জোর করলেও না। সোজা দৌড়ে বনে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাব। তবে সে সব তো পরের কথা, এখন কি করি? আমি ঠিক করলাম বাবা থাক আর না থাক, আমি এখানে আর এক মুহূর্তও থাকছি না। এখানে থাকাটা আমার পক্ষে বিপজ্জনক (যদিও না থাকাটা হয়তো আরও বেশি বিপজ্জনক)। তবে এত কষ্টের পর আরও সহ্য করব নাকি?

'অসম্ভব'! এই শেষ কথাটি চেঁচিয়ে বলে, আমি লাফিয়ে সোজা রাস্তায় নেমে পড়লাম। সেই সাদা কাপড়সহ। এত তাড়াতাড়ি লাফিয়েছি, যে বাবা বা নাপিত কিছু বুঝবার আগেই আমি সেলুনের বাইরে

এসে পড়েছি। তাড়াতাড়ি লাফাতে গিয়ে আরেকটা কাণ্ড হয়েছে। আয়নার সামনে কিসবের যেন অনেক শিশিবোতল এক ছোট টেবিলে রাখা ছিল। লাফাবার সময় আমার হাঁটু ওই টেবিলে খুব আল্‌তো করেই লেগে ছিল আর তাতেই সব শিশিবোতল দমাস্ করে মাটিতে পড়ে গেল। এ পুরোপুরি আমার দোষ হতে পারে না। নাপিতটা কেন ওগুলোকে আমার লাফাবার পথে রেখেছে? আর কেনই বা আমার ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিল? টেবিলটাই বা কেন এত নড়বড়ে ছিল যে এক আল্‌তো ছোঁওয়ায় সেটা হেলে পড়বে? নাপিতের জন্য ঠিকই হয়েছে। পাপের শাস্তি ভোগ করছে।

যাক, যা করেছি, করেছি। বাকিটা বাবা বুঝুক। বাবারও একটু প্রায়শ্চিত্ত দরকার। ফিক্ করে হেসে ফেললাম। সাদা কাপড়টা অতি কষ্টে খুলে একটা টুলের ওপর আস্তে করে রেখে দিলাম। ভেতরে একটু উঁকি মেরে দেখি দু'জনেই রাগ রাগ চোখে তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে, ও জোর ঝগড়া চলছে। এক দৌড়ে সোজা বাড়ি।

নবীনা রায়

গ্রাহক সংখ্যা ৪১৪১, বয়স ৬ বছর

- শুধুমাত্র ১৭ বছরের কম বয়েসি গ্রাহক-গ্রাহিকা এই বিভাগের জন্য লেখা-আঁকা পাঠাতে পারবে
- ছাপানোর জন্য পাঠানো লেখাটি কাগজের একপিঠে, পরিষ্কার হাতের লেখায় লিখবে
- সাদা পরিষ্কার কাগজের ওপর কালো রঙ দিয়ে পাতার মাপে ছবি আঁকতে হবে
- লেখা বা ছবির সঙ্গে তোমার নাম, গ্রাহক সংখ্যা ও বয়স কখনই লিখতে ভুলবে না

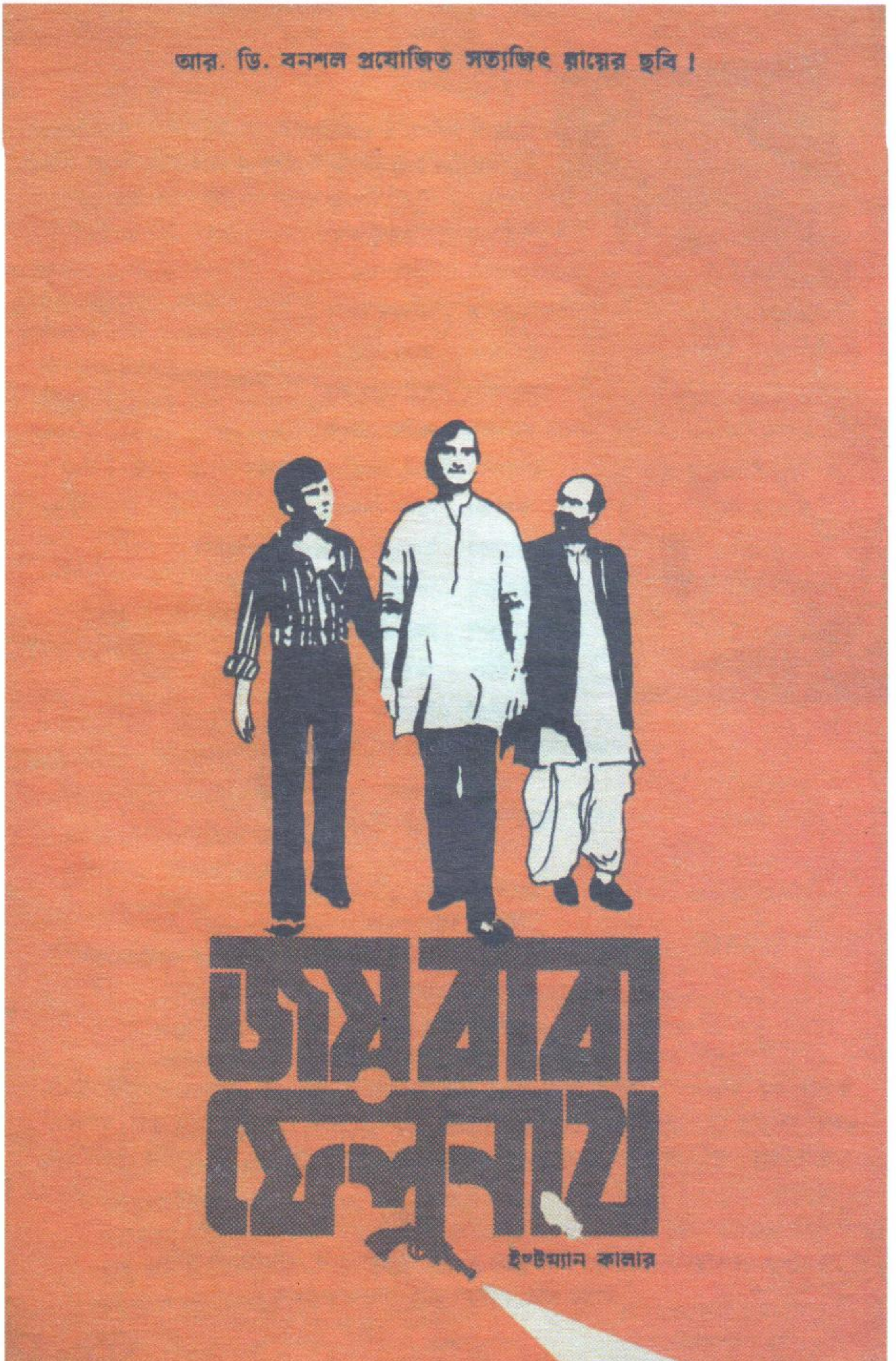
আর. ডি. বনশল প্রযোজিত সত্যজিৎ রায়ের ছবি ।
জয়বাবা ফেলুনাথ
ইষ্টম্যান কালার

প্রযোজনা

আর. ডি. বনশল

কাহিনী চিত্রনাট্য সংগীত ও পরিচালনা

সত্যজিৎ রায়

ক্যামেরা : **সৌমেন্দু রায়**

সম্পাদক : **দুলাল দত্ত**

শিল্প নির্দেশক : **অশোক বোস**

মেক-আপ : **অনন্ত দাস**

তত্ত্বাবধানে : **যতীশচন্দ্র রায়**

প্রধান কর্মসচিব : **অনিল চৌধুরী**

ব্যবস্থাপনা : **ভানু ঘোষ**

শব্দগ্রহণ : **রবিন সেনগুপ্ত**

অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ : **ইন্দ্রপুরী, ক্যালকাটা মুভিটোন**

স্থির চিত্র : **নিমাই ঘোষ, সন্দীপ রায়**

প্রতিমা নির্মাণ : **জিতেন পাল**

ভজন : **রেবা মুহরী**

সহকারী পরিচালক

রমেশ সেন, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ রায়

বিশ্ব পরিবেশনা

আর. ডি. বি. অ্যান্ড কোং

গোয়েন্দা ফেলুদার ভূমিকায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

রুকুর ভূমিকায়

শ্রীমান জিৎ বোস

উৎপল দত্ত (মগনলাল), **সন্তোষ দত্ত** (জটায়ু), **সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি** (তোপ্‌সে), **হারাধন ব্যানার্জি** (উমা), **সত্য ব্যানার্জি** (নিবারণ), **বিমল চ্যাটার্জি** (অম্বিকা), **বিপ্লব চ্যাটার্জি** (বিকাশ), **মলয় রায়** (গুণময়), **সন্তোষ সিংহ** (শশী), **ইন্দুভূষণ গুজরাল** (তেওয়াড়ী), **কামু মুখার্জি** (অর্জুন), **মনু মুখার্জি** (মছলিবাবা)

অন্যান্য ভূমিকায়

রাজকুমার লাহিড়ী, অবনীকুমার মুখার্জি, সুভদ্রা দেবী, পরিণীতা ব্যানার্জি, ভাস্কর পাত্র, সমীরণ রায়, পান্নালাল যাদব

'জয়বাবা ফেলুনাথ' বেরিয়েছিল ১৯৭৫-এ 'দেশ' পুজোসংখ্যায়। আর এই উপন্যাসকে চলচ্চিত্র হিসেবে পেলাম ক'বছর পর ৭৯-তে।
লেখা থেকে ছবি হওয়ার পথে চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়াটি সত্যজিৎ রায় শুরু করলেন করলেন ২১ জানুয়ারি ১৯৭৮। — সেই প্রথম খসড়া-চিত্রনাট্যটি খেরোর খাতা থেকে সরাসরি তুলে দেওয়া হল। — একেবারে হুবহু।
আর সেই সঙ্গে প্রত্যেক সংখ্যায় থাকবে 'অব্যবহৃত' যত টাইটেল কার্ড। দেখলেই বুঝবে কত ভেবে, কত যত্নে করা সব। কিন্তু হল কি, হঠাৎ বেনারসের গোটা ম্যাপটা হাতে এসে যেতেই আইডিয়া গেল বদলে। এত যত্নের কার্ডগুলো আর ব্যবহার করা হল না সিনেমায়।
এ জিনিস কিন্তু আগে কেউ দেখেনি— প্রথম তোমরাই দেখছ।

জয় বাবা ফেলুনাথ

বেনারসের নানারকম দৃশ্যের উপর

CREDIT TITLES

Cut to

Sq. – 1

GHOSHALS' RESIDENCE. VERANDAH OF COURTYARD. EVENING

দুর্গাপ্রতিমায় রং দেওয়া শুরু হয়েছে। বুড়ো শশী পটুয়াকে সাহায্য করছে রং জোগান দিয়ে একটি বছর বাইশের ছেলে। শশীর পাশে বসে তার কাজ দেখছে রুকু (রুক্মিণীকুমার)। রুকু অম্বিকা ঘোষালের নাতি এবং উমানাথ ঘোষালের ছেলে। শশী কাজ করতে করতে রুকুকে মহিষাসুর বধের গল্প বলছে।

শশী — তখন দেবতারা বললেন— সর্বনাশ, এই অসুরের সঙ্গে ত পারা যাচ্ছেনা! ব্রহ্মা একে এমন বর দিয়েছেন যে কোনো পুরুষ দেবতা একে বধ করতে পারবে না। তখন বিষ্ণু বললেন যে— এসো, আমাদের শরীরে যে তেজ আছে, সেই তেজ এক সঙ্গে মিশিয়ে আমরা এমন এক দেবী সৃষ্টি করি, যার হাতে মহিষাসুরকে মরতেই হবে। সেই চারজনের তেজ— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আর ইন্দ্র— আর সেই সঙ্গে আরো সব দেবতাদের তেজ একসঙ্গে মিলে সৃষ্টি হলেন দেবী দুর্গা। এই দুর্গার দশ হাতে দশ হাতে দশরকম অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়ে তার বাহনে চড়ে—

রুকু — বাহন কী?

শশী — অ্যাঁ—

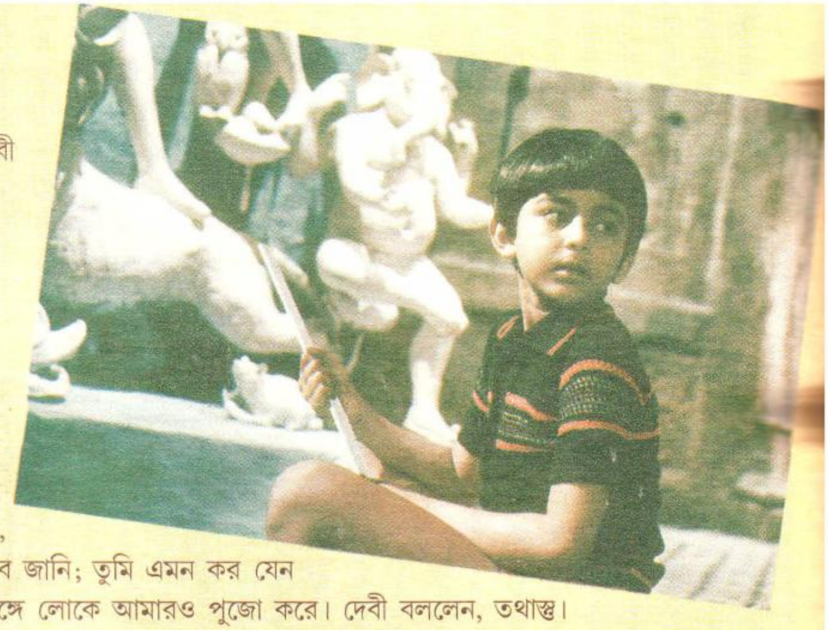

রুকু বাহন?

শশী বাহন হল যার পিঠে দেবী চড়ে আছেন— সিংহি মশাই। গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের ময়ূর, লক্ষ্মীর প্যাঁচা আর সরস্বতীর হল রাজহংস! তা এই সিংহের পিঠে চড়ে মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন দেবী। মহিষাসুর বললেন, দেবী, তোমার হাতে মরতে হবে জানি; তুমি এমন কর যেন তোমার পুজোর সঙ্গে সঙ্গে লোকে আমারও পুজো করে। দেবী বললেন, তথাস্তু।

রুকু তথাস্তু?

শশী হ্যাঁ! — তথাস্তু—মানে তাই হোক্। সেই থেকে মহিষাসুর রয়ে গেলেন দেবীর পায়ের তলায়। আর দেবীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও পুজো হতে লাগল!

রুকু এসব সত্যি?

শশী মিথ্যেই বা কী করে বলি রুকুবাবু। মুনি-ঋষিরা লিখে গেছেন ত সব!

রুকু সব সত্যি! —মহিষাসুর সত্যি, হনুমান সত্যি, ক্যাপ্টেন স্পার্ক সত্যি, অরণ্যদেব সত্যি, টার্জান সত্যি, হিজিবিজবিজ সত্যি...

একটা গাড়ির শব্দ শোনা যায়। রুকু কথা থামায়।

রুকু গাড়ি এল!

রুকু দৌড়ে বাড়ির ভিতর চলে যায়।

THE MAIN DOOR

রুকু দৌড়ে এসে দরজা খুলেই দেখে একটা ট্যাক্সি থেকে একজন মাঝবয়সী মারোয়াড়ি-গোছের ভদ্রলোক নামছে। দেখে বেশ হোমরা-চোমরা ডাকসাইটে লোক বলে মনে হয়।

রুকু দৌড়ে ল্যান্ডিং-এর সামনেই একটা ঘরের দরজার মুখটায় এসে পর্দা সরিয়ে ভিতরে মুখ গলিয়ে দেয়।

BIKASH'S ROOM

বছর ২৭/২৮ এর একটি ভদ্রলোক খাটে শুয়ে 'আনন্দলোক' জাতীয় একটা পত্রিকা পড়ছে। তার পাশে টেবিলে রেডিও, তাতে আখতারির গান হচ্ছে। রুকু দরজা থেকে তাকে সম্বোধন করে—

রুকু বিকাশকাকু! — ডাকু গন্ডারিয়া!

কলিং বেল বেজে ওঠে। বিকাশ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে।

LANDING

বিকাশ দরজায় এসে আগন্তুককে দেখে। ইনি ধনী ব্যবসায়ী মগনলাল মেঘরাজ।

মগন মিস্টার ঘোষাল আছেন?

বিকাশ কোন মিস্টার ঘোষাল?
মগন উমানাথ ঘোষাল। বোলো মগনলাল মেঘরাজ দেখা করতে এসেছেন।

রুকু একটু দূরে দাড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছে।

বিকাশ রুকু যাও, বাবাকে বল— বল মিঃ মেঘরাজ এসেছেন। (to Meghraj) আসুন আপনি।

রুকু এক লাফে সিড়ি দিয়ে দোতলায় চলে যায়।

DRAWING ROOM

বেশ বড় ঘর। তবে আসবাবপত্রের অবস্থা খুব ভালো নয়। এখন যে ঘোষালের অবস্থা আর আগের মতো নেই সেটার আন্দাজ এই ঘর থেকেই পাওয়া যায়। দেয়ালে ঘোষালদের পূর্বপুরুষদের ছবি রয়েছে। তাছাড়া পুরোন কিছু অয়েল পেন্টিং রয়েছে।

বিকাশ মগনলালকে নিয়ে প্রবেশ করে।

বিকাশ বসুন।
মগন আপনার পরিচয়?
বিকাশ আমার নাম বিকাশ সিংহ।
মগন উমানাথের Relation আপনি?
বিকাশ না। আমি থাকি এখানেই।
মগন I see ...

বিকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মগনলাল পায়চারি করে— বসার তাড়া নেই।

LANDING

উমানাথ নেমে আসছে, বিকাশের সঙ্গে দেখা হয়।

উমা শোন, সরোজরা সপ্তমীর দিন এসে পৌঁছাচ্ছে Doon Express। আর সেইদিনই মেজদিরাও আসছে Amritsar Mail-এ। দুটোই attend করবে—
বিকাশ ঠিক আছে—

DRAWING ROOM

উমানাথ আসে। মগনলাল তার দিকে হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যায়।

মগন Brother!
উমা কী ব্যাপার? এত কাল পরে হঠাৎ...

দুজনে পাশাপাশি দুটো সোফায় বসে।

মগন কত দিন হল?
উমা তা মন্দ কি? আমি পাশ করেছি 50-তে, তুমি 51। এক বছর ফেল করলে ত!

মগনলাল হো হো করে হেসে ওঠে।

BIKASH'S ROOM

বিকাশের হাবভাবে বোঝা যায় যে মগনলাল সম্পর্কে তার কৌতূহল হচ্ছে। সে পাশের ঘরে কি কথা হচ্ছে সেটা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়। রেডিওর Volumeটা একটু কমিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

DRAWING ROOM

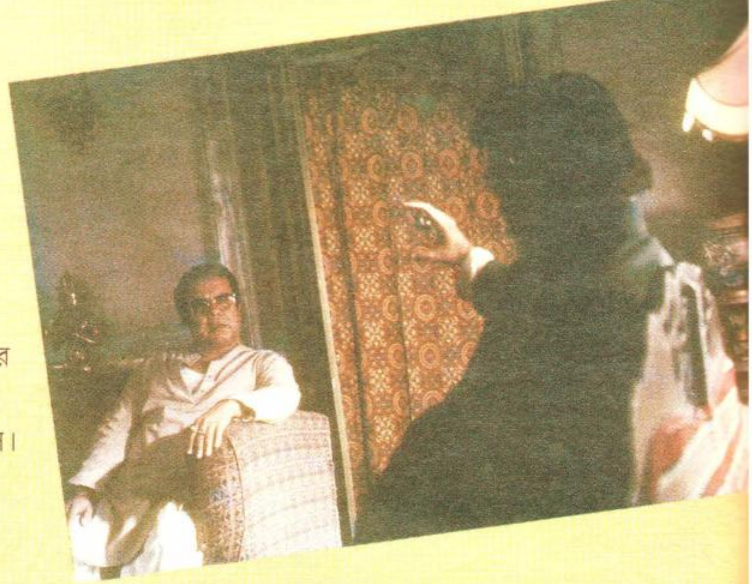

মগন — সেদিন মছলিবাবার দর্শনে দেখলাম তুমি আর তোমার wife কে—

উমা — আমি স্রেফ গান শুনতে যাই ভাই— ওসব ভক্তি-টক্তি আমার আসে না।

মগন — দেখার পর থেকে ভাবছি একবার আসব।

উমা — আমরা ত প্রতিবার পুজোয় আসি। বাড়িতে পুজো। বাবা আছেন, ঠাকুরদা— ঠাকুরমাও আছেন—

মগন — আর তোমার গণেশ?

উমা — গণেশ?

বাইরের দরজার আড়াল থেকে বিকাশ শুনছে।

উমা — বাবা! তোমার ত খুব মনে আছে দেখছি?

মগন — আছে?

উমা — যাবে কোথায়? ও জিনিস ত আমাদের পরিবারের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে গেছে।

মগন — একবার দেখাবে?

উমা — (হেসে) আমার বাবার ঘরের সিন্দুকে থাকে— চাবি বাবার দেরাজে।

মগন — তোমার বাবা কাউকে দেখান না?

উমা — দেখাবেন না কেন? অনেকেই দেখতে চায়। তবে তাদের দেখানো আর তোমাকে দেখানো ত এক জিনিস নয়। তোমার যে বাজারে খুব সুনাম নেই ভাই!

মগন — পয়সা বেশি হলে বদনাম হবেই উমানাথ। আমার মতো পয়সা করো, তোমারও বদনাম হবে।

উমা — টাকাটা কী উপায়ে করছ সেটাও ত দেখতে হবে। গুজব শুনি তুমি নাকি দেশের — মানে, যাকে বলে শিল্পসম্পদ— পুরোন ছবি, পুরোন মূর্তি— এসব নাকি বাইরে কারোর কাছে...? American-রা সব মোটাসোটা টাকায় কিনে নিচ্ছে?

মগন — আমি চোদ্দ হাজার দেব তুমাকে— cash। সঙ্গে এনেছি।

মগনলাল তার পাশের রাখা একটা ব্যাগের উপর হাত চাপড়ে বুঝিয়ে দেয় সে সঙ্গে টাকা এনেছে।

উমা — আমাদের গণেশ ত তুমি চোখেই দেখনি— তার জন্য এতগুলো টাকা offer করছ?

মগন — Gold figure– $2^1/_2$ inch. Crown-এ diamond, base-এ মুক্তো আর চুনি। নেপালের জিনিস।

বিকাশ আড়ি পেতে বসেছে।

উমা — এসব জানলে কি করে? আমি ত বলিনি?

মগন নেপালের রাজা তুমার grandfather-কে দিয়েছিল। ঠিক কি না?

উমা আমার বংশের ইতিহাস তুমি জেনে বসে আছ নাকি?

মগনলাল এবার তার পকেট থেকে একটা খবরের কাগজের cutting বার করে উমানাথকে দেয়।

মগন তুমার father-এর লিখা article।

দেখা যায় article-এর সঙ্গে গণেশের একটা ছবিও রয়েছে।

উমা (cuttingটা দেখছে) বা-বা! এই cutting তুমি অ্যাদ্দিন রেখে দিয়েছ?

মগনলালের চোখ যায় বারান্দার দরজার দিকে। পর্দার এক পাশে একটি মানুষের মুখের খানিকটা অংশের ছায়া পড়েছে। মগনলাল ব্যাপারটা এক ঝলক বুঝে নিয়ে উমার দিকে দৃষ্টি দেয়।

মগন Twenty five thousand, উমানাথ!

উমানাথ এক মুহূর্ত চুপ।

মগন আমি তোমার ব্যবসার ব্যাপার জানে। তোমার বাজারে কতো দেনা সো ভী জানে।

উমা এ জিনিস তোমায় বিক্রী করতে হলে আগে আমায় চুরিবিদ্যে শিখতে হবে। বিক্রীর কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

বিকাশ এখনো আড়ি পাতছে।
মগনলাল আরেকবার পর্দার দিকে দেখে।

মগন Thirty thousand। আমি ক্যাশ দিচ্ছি উমানাথ।

উমানাথ চুপ করে বসে। একটা সিগারেট ধরায়। Uma shakes his head।
মগনলালের গলার স্বর এখন কঠিন।

মগন সকল-এর কাছে আমি জিনিস চেয়ে নেইনা উমানাথ। দরকার হলে নিয়ে নেই। তাতে আমার পয়সাও লাগে না। I take what I want। তোমার সঙ্গে আমি খোলাখুলি কাম করছি উমানাথ।

উমা Sorry মগনলাল।

মগন এই তোমার শেষ কথা?

উমা এই শেষ কথা।

বিকাশ দরজা থেকে সরে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

AMBIKA GHOSHAL'S BEDROOM

অম্বিকা ঘুমোচ্ছেন। তার টেবিলের ঘড়িতে রাত দেড়টা। ক্যামেরা টেবিলের দেরাজের দিকে এগিয়ে যায়। একটা হাত এসে অতি সাবধানে দেরাজটা খোলে। তার থেকে চাবি বার করে। তারপর আবার নিঃশব্দে দেরাজ বন্ধ করে দেয়।
সিন্দুক। চাবি সিন্দুকের দিকে এগিয়ে যায়।
ঘোষাল এখনো ঘুমোচ্ছেন।

চাবি ঘুরে যায়। সিন্দুকের দরজা খুলতে শুরু করে। একটা সামান্য ক্যাঁচ শব্দ হয়। ঘোষালের ঘুম ভাঙে না।

এবার সিন্দুকের দরজা বন্ধ হচ্ছে। আবার ক্যাঁচ শব্দটা হয়। এবার ঘোষালের ঘুম ভাঙে।

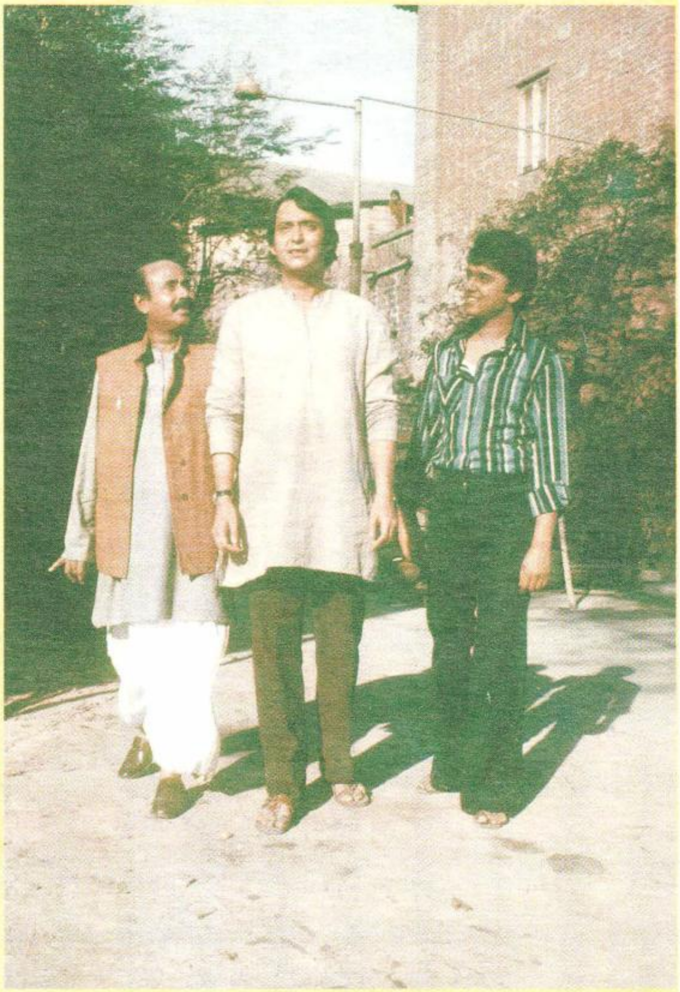

ঘোষাল কে?

ঘোষাল একটু উঠে বসে, দরজার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

Sq. – 2

BENARES EXTERIOR. MAIN THOROUGHFARE. DAY

বেনারস। বাইরে বড় রাস্তা। দিনের বেলা।

দুটো সাইকেল রিকসা পাশাপাশি চলেছে। একটাতে ফেলু, অন্যটাতে লালমোহন ও তোপ্‌সে। দুটোতেই মাল রয়েছে।

লালমোহন তার ডান দিকের কোনো একটা অদৃশ্য মন্দিরকে লক্ষ্য করে কপালে হাত ঠেকায়। তোপসে সেটা লক্ষ্য করে।

লালমোহন এবার বাঁ দিকে উদ্দেশ্য করে নমস্কার করে।

তোপ্‌সে তার চেয়ে হাত দুটো কপালেই ঠেকিয়ে রাখুন না— এতে ত হাত ব্যথা হয়ে যাবে?

লাল কটা মন্দির আছে জান কাশীতে?

তোপ্‌সে কটা?

লালমোহন সামনের রিকশার দিকে ঝুঁকে পড়ে হাঁক দেন।

লাল ফেলুবাবু!

ফেলু ঘাড় ঘোরায়।

লাল কাশীতে মন্দিরের সংখ্যা কত?

ফেলু তেত্রিশ কোটি।

(চলবে)

ফোটো : সন্দীপ রায়

অঙ্কের মজা!

স্বপ্নাভ রায়চৌধুরী

আমার ছোট বোন ভূগোলে ৩৯ পেল। ফেল। কাঁদোকাঁদো মুখ। আমি ওকে রাগিয়ে দেবার জন্য বললাম, 'ও কিস্‌সু নয়। যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন'।

টুসি বলল, 'ইয়ার্কি হচ্ছে ছোড়দা'?

বললাম, আরও রাগিয়ে দিয়ে, ''ও উনিশ বিশ একই কথা। ৩৯-ও যা, ৪০-ও তাই'।

টুসি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। মেলাই চিৎকার চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিল। আমায় ক্যাপ্টেন হ্যাডকের মতো বলতে থাকল 'বেবুন, টিকটিকি, হিপো, উরুগুয়ে, মেছোহাটা কোথাকার'।

এতেও শান্ত না হয়ে যখন শারীরিক আক্রমণে উদ্যত হল, গম্ভীর হয়ে গেলাম। ভূগোলে ফেল করলে কি হবে, টুসি অঙ্কটা জানে ভালই। বললাম, 'দে, খাতা দে, পেন দে।'

টুসি একটু শান্ত হয়ে বলল, 'ফ্যালাসি'?

বললাম, 'ইয়েস ডিয়ার সিস্টার। আমি একটা অঙ্ক কষে যাব। স্টেপ বাই স্টেপ। কোনও স্টেপ-এ ভুল থাকলে বলবি।'

আমি লিখতে থাকলাম।

$$২০ = ২০$$

বা, $-২০ = -২০$

বা, $১৬ - ৩৬ = ২৫ - ৪৫$

বা, $(৪)^২ - ৪ \times ৯ = (৫)^২ - ৫ \times ৯$

বা, $(৪)^২ - ২ \times ৪ \times \frac{৯}{২} = (৫)^২ - ২ \times ৫ \times \frac{৯}{২}$

বা, $(৪)^২ - ২ \times ৪ \times \frac{৯}{২} + (\frac{৯}{২})^২ = (৫)^২ - ২ \times ৫ \times \frac{৯}{২} + (\frac{৯}{২})^২$

বা, $(৪ - \frac{৯}{২})^২ = (৫ - \frac{৯}{২})^২$

বা, $৪ - \frac{৯}{২} = ৫ - \frac{৯}{২}$

বা, $৪ = ৫$

টুসি হৈ হৈ করে উঠল। বলল, 'এর মানে কী? ৪ আর ৫ এক'?

বললাম, 'হল তো। হল না? তাহলে বল, ৩৯ আর ৪০ এক নয়? এখনও বলবি, তুই ফেল করেছিস? টুসি গালে হাত বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর বলল, 'বুঝেছি'।

বললাম, 'জানি তো, বুঝতে পারবি কোথায় ফ্যালাসি'।

তোমরা বলতে পার? বলতেই হবে। নাহলে তো কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। পৃথিবীর সব সংখ্যা সব সংখ্যার সঙ্গে সমান হয়ে গিয়ে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটাতে থাকবে। তাই তো?

ভুলটা কোথায় ধরতে পারলে জানাও। পরের সংখ্যায় জানাব তোমার নাম। ভুলটাও জানিয়ে দেব, অবশ্যই।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

নদীর তীরে একা

জীবন সর্দার

অনেক নদীর তীরে আমি একা একাই গিয়েছি। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর একটাই— প্রকৃতি-পড়ুয়া হব বলে। তবে নদীর তীরে গিয়ে বসে থাকিনি, শুধু ঢেউয়ের ওঠানামা দেখিনি, ওই নদী কেমন নদী, সেই খোঁজ নেওয়া ছিল আমার খেলা। ছিল কেন বলছি, এখনও আমি ফুরসৎ পেলে, একটা না একটা, নদীর তীরে যাই।

এবার বর্ষায় বৃষ্টি হয়েছে কম। কিন্তু শরতে পরপর কদিন ঝমঝম বৃষ্টি হতেই নদীরা রঙ পালটে নিল। আমার প্রিয় নদী তিনটিকে একটু ভরা ভরা দেখলাম। ইছামতীর তীরে বসার সুযোগ ছিল না, তাই পশ্চিমে দামোদরের তীরে, আমার প্রিয় ঘাট 'খাদিনানের' পথে পাড়ি দিলাম। ওই ঘাটে যাবার দুটি পথ। একটি বাঁধের উপর দিয়ে। হেঁটে। অন্যটি নৌকোয়। আমি হেঁটে যাওয়া ভালবাসি আর সেটা হবে জলের কিনার ধরে।

কিন্তু সেদিন মহিষরেখা ঘাটে একটা ডিঙি পেয়ে গেলাম। সেই ডিঙির মাঝিকে আমি খুব চিনি। সে বলল 'এবার কী মনে করে? চৈত্র মাসেই তো এসেছিলেন।' 'তখন ছিল শুকনো কাল। দামোদরের তখন অন্য রূপ। তার তীর ধরে সবজি ফসল ছিল দেখার মত। আর এখন জল ভরা নদী দেখতে এসেছি', আমার উত্তর সোজা।

দামোদরের উপর বম্বেরোডের পুলের কাছে মহিষবাথান। আমার পক্ষে সেখানে পৌঁছে যাওয়া কঠিন নয়। তাই একই নদীকে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে দেখতে যাই। দেখে দেখে শিখি নদীর নানান রকম দশা।

ডিঙিতে বসে মাঝিকে বললাম 'মনু, নৌকো খুলতে হবে না। এসো বসি। দু'জনে নদীর কথা বলি।' মনু আমার মুখোমুখি বসল। বললাম 'দামোদরে এখন জোয়ার ভাটা খেলে না? রূপনারাণ, ইছামতী— দুই নদীতে জল বাড়ে কমে। জোয়ার-ভাটা হয়।'

'ভাটাতো লেগেই আছে। উপরে বাঁধের জল ছাড়লেই হৈ হৈ করে জল নেমে আসে। নইলে ভাটায় ঢিলা থাকে। কিন্তু জোয়ারের জল কেরামতি দেখাতে পারে না।'

'কেন?' 'কেন আবার! নদীর মুখে গেট আছে না। ওই গেট দিয়ে গঙ্গার জল আসা যাওয়া ঠিক হয়।'

'ঠিক, তা দেখেছি আমি। কিন্তু তাতে অসুবিধা কী। চাষের কাজ, মাছ ধরার কাজ এসবতো কমতি হয় না।'

মনু চুপ করে আমার কথা শুনছিল। আমার নজরে পড়ল একটা সাদাকালো মাছরাঙা। ফটকা। চুপচাপ নদীর উপর ঝুঁকে থাকা একটা গাছের ডালে এসে বসল সেটা। 'মনু', আমি প্রশ্ন করলাম, 'নদীর ধারের পাখিদের দেখছি না তো! কোথায় গেল সব?'

'কী পাখি?' উলটো প্রশ্ন তার। শীতের সময় সময়

খঞ্জন আসবে। এখন ওদের দেখা পাবে না। কাদাখোঁচা, সেগুলো হয়তো শীত পড়তে না পড়তেই হাজির হবে। কিন্তু বালিহাঁস এদিকে শীতেও দেখবে না।'

'কেন? আমি তো রূপনারাণের চড়ায় কার্তিক মাসেই সরাল দেখেছি।' 'সরাল হয়তো দেখতে পাবে এদিকে। আর কদিন পরেই। রাতের বেলা ঝাঁক বেঁধে যায়। কিন্তু চখা কিংবা বড জাতের হাঁস চরে না গেলে দেখা যাবে না।'

মনুর অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে বেশি। আমিও দমবার পাত্র নই। বললাম, 'এই বছরই দামোদরের চরে চখা দেখেছি।' অবাক সে। বলল, 'কোথায়?' 'দামোদরের চরে— ওই যে আসানসোল থেকে আদ্রা যাবার লাইনে দামোদরের উপর দামোদর ইস্টিশন্ সেখানে। নদী খুব চওড়া বটে, তবে জল নেই। তার চড়ায় চখা দেখেছি, কাদাখোঁচা দেখেছি। মেছোবক দেখেছি।'

মনু আমার কথা শুনে হেসে ফেলল।

'এক নদীর অনেক রকম হয়। যেখানে যেমন মাটি তেমন তার দশা।'

আমাকে চমকে দিয়ে নৌকো খুলে দিল মনু। এবার তীরের গাছপালা, মাটির রঙ, এমনকি বছর বছর পলি জমে যে স্তর পড়েছে তার দেখা পাব। এখানে এই নদীর তীরে আটকে থাকা শামুক-গেঁড়ি-গুগলির খোলস দেখতে পাব। এবার ওপারের পাখির, প্রজাপতির চলাচল দেখতে পাব। এখন আর কথা নয়, শুধু একমনে দেখা।

প্রকৃতি-পড়ুয়ার ভাবনা

প্রকৃতি ঃ এক বিপন্ন স্রষ্টা

প্রকৃতির ব্যবস্থা প্রকৃতি নিজেই গড়ে তোলে। মাটির ব্যবস্থা নিয়েও তার 'চিন্তার' অন্ত নেই। তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছে। কিন্তু পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন জৈব সার ও রাসায়নিক ঔষধ ও কীটনাশক প্রয়োগের ফলে এই ব্যবস্থা আজ বিপন্ন। একদিকে ওসব পদার্থ আমাদের শরীরে বিপজ্জনক মাত্রায় শষ্যের মাধ্যমে প্রবেশ করে সমস্যা ঘটাচ্ছে। অপর দিকে উদ্ভিদের দেহে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে, বিভিন্ন জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও শৈবাল ইত্যাদিকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। প্রটোজোয়া ও ব্যাকটেরিয়ার বিপাকক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে মাটির চরিত্র ও ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। আবার দীর্ঘদিন ধরে এক জমির ব্যবহার ও ফসলের উৎপাদন মাটির ক্ষতি করছে। প্রকৃতির ফসল প্রকৃতিকেই তার সব ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়ায় অসুবিধা হত না, কিন্তু বর্তমানে ফসলের সার পদার্থ ও বর্জ্য জমিতে জমার সুযোগ না পেয়ে খাদ্য হিসেবে ও নিকাশীর মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। ফলে প্রয়োজনীয় জৈব উপাদান না পাওয়ায় জমির উৎপাদনের যেমন ক্ষতি হয়, তেমন রাসায়নিক সারের ব্যবহার মাটির প্রাণজগৎকে ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিনে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতাকেও নষ্ট করে দেয়। মাটির স্বাভাবিক ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যেতে থাকে। তাই মনে হয় যে মহাশক্তি প্রকৃতি, চারপাশের সবকিছুই যে সৃষ্টি করেছে, আজ বুঝি সে বড় বিপন্ন।

শঙ্খশুভ্র মল্লিক

ফোটো : অচিন্ত্য সুরাল

জানো কি?

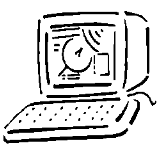

সারা পৃথিবীতে কম্পুটারে যে তথ্য সংগৃহীত থাকে, তারই এক বিশেষ নাম 'ডেটা-বেস'। বিশ্বের বৃহত্তম ডেটা-বেস আছে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর' এর 'বাবর' (BABAR) পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত কম্পুটার শ্রেণীতে। এতে সংগৃহীত মোট তথ্যের পরিমাণ সম্প্রতি ৫ লক্ষ গিগাবাইট ছাড়িয়ে গেছে এবং দৈনিক আরো ৫০০ গিগাবাইট তথ্য জমা পড়ছে। বিশ্বের বৃহত্তম লাইব্রেরি ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস-এর সমস্ত বইয়ের তথ্যের তুলনায় এটি ৬০ গুণ বেশি।

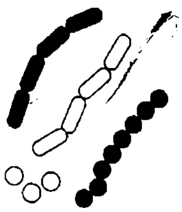

গত কয়েক মাস সার্স (SARS) রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়ে সারা দুনিয়া প্রায় কেঁপে উঠেছিল। ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ চীনের গুয়াংডং (বা ক্যান্টন) অঞ্চলে এই রোগের কথা প্রথম জানা যায়। জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত মোট ৮৪৩৬ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, মারা গেছেন ৮১২ জন। অবশ্য এর শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি চীন দেশেই। রোগের সঠিক প্রকৃতি এবং চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা চলেছে সারা দুনিয়া জুড়ে। এর ভাইরাসটি আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে, এটি এক নতুন ধরনের 'করোনা ভাইরাস'। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের দু-দল বিজ্ঞানী সার্স ভাইরাসের জিন বিশ্লেষণ করে জিন ম্যাপ তৈরি করেছেন, আশা করা যায় এর ফলে চিকিৎসার এক নতুন দিক খুলে যাবে। এইড্‌স্ রোগের ক্ষেত্রে এ-কাজ করতে প্রায় তিন বছর লেগেছিল, এবার তিন মাসও লাগেনি। আরও জানা গেছে যে সম্ভবত সড়েল বা ভাম বা ব্যাজার জাতীয় কোনো জন্তু থেকেই এই ভাইরাস মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এইড্‌স্ রোগ এসেছিল বানর জাতীয় প্রাণী থেকে।

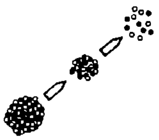

বিজ্ঞানীদের অনেকের ধারণা ছিল বোধহয় মৌল কণিকাগুলি সবই তাঁদের জানা হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছিলেন মৌল কণিকা খোঁজার কাজে আর তেমন উত্তেজনা নেই। এবছরের এপ্রিল মাসে বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী মার্সেলো জিয়র্জি জানিয়েছেন একটি নতুন কণিকা আবিষ্কারের কথা। এর নাম দেওয়া হয়েছে ডি, এস-২৩১৭, কারণ এর ভর ২৩১৭ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট। এর স্বরূপ বিজ্ঞানীরা এখনও ঠিক জানেন না। কেউ মনে করছেন এটি চারটি কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি, আবার কেউবা ভাবছেন এটি একটা কোয়ার্কের চারদিকে ঘূর্ণায়মান আরেকটি কোয়ার্ক। এ নিয়ে আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানের একটি গবেষণা সংস্থাতেও কাজ চলছে।

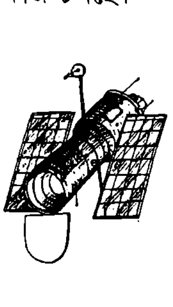

২০০৩ সালে ১৬ই জানুয়ারি কলাম্বিয়া মহাকাশযান ছাড়া হয়েছিল নাসা'র কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে। সকলেরই মনে আছে যে ফিরে আসার সময় দুর্ঘটনায় স্পেস-শাটলটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, কল্পনা চাওলা সমেত সাতজন মহাকাশচারীই মারা যান। এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের কাজ চলছিল। সেপ্টেম্বর মাসে এক ৭৮ পাতার রিপোর্টে নাসা নিজেদের ভুল স্বীকার করলেন এবং সেই সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে এইসব ভুল সংশোধন করে পরবর্তী স্পেস-শাটল ছাড়া হবে ২০০৪ সালের মার্চ মাসে।

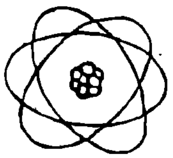

১১০নং মৌলের নতুন নাম হল। ১৯৩৯ সাল থেকে ইউরেনিয়াম-উত্তর অর্থাৎ ৯২-এর বেশি পারমাণবিক সংখ্যার অনেকগুলি মৌল পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম দিকে সবগুলি নতুন মৌল আবিষ্কৃত হয়েছিল আমেরিকার বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে অনেকগুলি আবিষ্কৃত হয় রাশিয়ার ডুবনায়। সম্প্রতি এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে জার্মানির ডার্মস্টাট শহরের জি, এস, আই গবেষণা সংস্থা। তারাই ১১০ নম্বর মৌলের আবিষ্কার ঘোষণা করে ১৯৯৪ সালে। এত দিনে আন্তর্জাতিক রসায়ন বিজ্ঞানীদের সংস্থা IUPAC তার নামকরণ করলেন ডার্মস্টাটিয়াম। ডার্মস্টাট শহরের জুটল এই নতুন সম্মান। লরেন্সিয়াম (১০৩), রাদারফোর্ডিয়াম (১০৪), ডুবনিয়াম (১০৫), সীবর্গিয়াম (১০৬), বোহরিয়াম (১০৭), মাইটনারিয়াম (১০৮) ও হ্যাসিয়াম (১০৯)-এর পরে মৌল তালিকায় যুক্ত হল ডার্মস্টাটিয়াম (১১০)। মৌল পদার্থটি অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী হলেও তার রাসায়নিক ধর্মের পরিচয় পাওয়া গেছে। এর ভর সংখ্যা ২৭১।

মেঘের ওজন কত? আমেরিকার বোল্ডারে আবহাওয়াবিদ পেগি লেমোন তা মাপার ব্যবস্থা করেছেন। ফলাফল আমাদের তাজ্জব করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। পেঁজা তুলোর মত কিউমুলাস মেঘের গড় ওজন ৫৫০ টন, অর্থাৎ ১০০ হাতির ওজন। বর্ষার জল ভরা কিউমুলোনিম্বাস মেঘের গড় ওজন ১০ লক্ষ টন অর্থাৎ দুই লক্ষ হাতির ওজন। আর খুব বড় টর্নেডো বা হারিকেনের মেঘের ওজন তো আরও ২০০ গুণ বেশি— চার কোটি হাতির ওজন। ভাবা যায়?

এবছরের ২৭ অগাস্ট মঙ্গলগ্রহ এসেছিল পৃথিবী থেকে মাত্র ৫৬ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে। গত ৬০,০০০ বছরে এত কাছে কখনো আসেনি, যদিও ২২৮৭ সালে নাকি আরো কাছে আসবে। এই সুযোগে মঙ্গল দেখার ধূম পড়ে গিয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে। তার চেয়েও বড় কথা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেকগুলি মহাকাশযান রওনা দিয়েছে মঙ্গল অভিমুখে, উদ্দেশ্য মঙ্গলের মাটিতে নেমে স্যাম্পল সংগ্রহ করে গবেষণা করা। সাত বছর পরিকল্পনা করার পর নাসা মঙ্গলে দুটো রকেট পাঠিয়েছে জুন ও জুলাই মাসে, তাদের নাম অপরচুনিটি আর স্পিরিট। প্রায় সাত মাস লাগবে মঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছতে। পৌঁছে সেখান থেকে ছ-চাকাওয়ালা রোবটিক গাড়ি রোভার নামানো হবে মঙ্গলের মাটিতে। উদ্দেশ্য মঙ্গলে জীবনের সন্ধান খুঁজে বার করা। ১৮৭৭ সালে ইতালির জ্যোতির্বিজ্ঞানী শিয়াপারেল্লি মঙ্গলে ক্যানাল আবিষ্কার করেছিলেন। তাই নিয়ে তখন বেশ সাড়া পড়ে যায় ক্যানালগুলি কোন জীবিত প্রাণীর সৃষ্টি মনে করে। পরে প্রমাণিত হয় এই ক্যানাল প্রাকৃতিক কারণেই সৃষ্ট। এখন এই রোভার দুটি মঙ্গলের বিভিন্ন এলাকা থেকে মাটি, পাথর ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখবে মঙ্গলে জীবন সৃষ্টির মতন জল ছিল কিনা। মার্কিনরা অবশ্য একাজে একা নয়। তাদের চেয়ে অনেক কম খরচে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সিও মঙ্গলে রকেট পাঠাচ্ছে, তাদের রোবটিক গাড়ির নাম বীগল-২। আবার জাপানিরাও মঙ্গল অভিযান চালাচ্ছে প্রায় একই সময়ে। মঙ্গল নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে বললেই হয়। দেখা যাক, প্রথম সাফল্য পায় কারা।

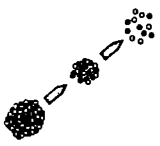

ডি, এস— ২৩১৭ কণিকা নিয়ে উত্তেজনা মেলাতে না মেলাতেই আবার নতুন কণিকার সন্ধান পাওয়া গেল। জুলাই মাসে 'ফিজিকাল রিভিউ লেটার্স'-এ একটি চিঠিতে জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাকাশি নাকানা জানিয়েছেন যে তাঁরা একটি নতুন কণিকার সন্ধান পেয়েছেন যেটি পাঁচটি কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত। আগেই কোপেনহাগেনের বিজ্ঞানী ডিয়াকোনভ বলেছিলেন যে এরকম কণিকা পাওয়া যেতে পারে যদিও গত কয়েক বছরে এই কণিকার হদিশ পাওয়া যায়নি। এবার নাকানাদের আবিষ্কার অন্যান্য বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করবে। গবেষকরা মনে করছেন যে এরকম আরও ন'টি কণিকা আছে। এবার তাদের খোঁজ চলবে জোর কদমে।

নন্দ গুপীর মন্দ কপাল
দিলীপ দাস
আমরা নন্দ-গুপী এসে গেছি স্যার।
বেশ, তাহলে তোমরা আমার কাছে ড্রইং শিখবেই স্থির করেছো?
প্রথমেই আমি তোমাদের ফোলিয়েজ ড্রইং শেখাবো।
এই গাছটাকে তোমরা যে যেমন দেখতে পাবে ড্র করো।
তেমন অসুবিধা হলে এর থেকে দু'একটা পাতা বাদ দিয়ে নিতে পারো।
নাও, এখন বসে না থেকে কাজ শুরু করো আমি পাশের ঘরে আছি।
সাবজেক্টটা বেশ কঠিন দিয়েছেন নারে নন্দ?
গাছের অতগুলো পাতা আঁকা কি সুখের কথা!
আচ্ছা গুপী, স্যার তো বলেই গেছেন অসুবিধা হলে কয়েকটা পাতা বাদ দিতে পারি?
তাহলে মিছেমিছি ঝামেলা না করে এর থেকে আমি বরং দু'টো পাতা ভেঙেই দেই।

এবার একটু সহজ মনে হচ্ছে, তাই না গুপী?
সহজ না হলেও মোটামুটি একটু পথে এসেছে।
গাছটার আর আর দু'টো পাতা ছেঁটে দিলে কেমন হয়?
ভালই হয়। তাহলে দেই ছেঁটে।
সবই গেল, এই দু'টোই বা থাকে কেন?
কোনো প্রয়োজন নেই সুতরাং—
কেমন কাঠি কাঠি লাগছে না?
তা লাগছে কিন্তু গাছ তো বটে। এতে আমাদের আঁকতে কত সুবিধা হল বল।
বেশ কিছু সময় পর-
কী এঁকেছিসরে এটা?
আমাদের ড্রইং স্যার।
বলেছিলেন ইচ্ছে করলে গাছের কয়েকটা পাতা বাদ দিতে পারি তাই—
একটা দুটো করে পাতা বাদ দিতে দিতে এই রকম হয়ে গেল স্যার!
হুম্!
হতচ্ছাড়া, এই তোদের আঁকার ছিরি? আর খবরদার এমুখো হবি না!

যমুনাবতী

রাজা রায়

এক : গোড়ার কথা

''যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে।''

আয়াদিদির পরিচিত গলায় গানটা ভেসে আসছিল, কিন্তু যেন অনেক দূর থেকে। কেন, এত দূর থেকে কেন? সারা গায়ে তার এত ব্যথাই বা কেন? ভাবছিল রূপু। রূপু মানে রূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। স্কুলের বন্ধুরা তাদের রূপু বলেই জানে, যদিও বাড়িতে মা ডাকেন খোকন বলে। খোকন নামটা রূপুর একটুও পছন্দ নয়। খোকন আবার কী? সে কি আর ছোট্ট আছে নাকি? ওর তো আট বছর পুরে গেছে সেই কবেই। তবে?

হ্যাঁ, এবার আস্তে আস্তে সব কথাই মনে পড়ছে রূপুর। শনিবার, তাই স্কুল ছুটি ছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠেওছে দেরি করে। প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে তখন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল আকাশ মেঘলা, ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, টিপটিপ বৃষ্টিও পড়ছে। ওঃ তাই বলো! বৃষ্টি পড়ছে বলে ক্রিকেট প্র্যাকটিস হবে না— মা তাই সক্কালবেলায় ডাকেনও নি। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে দাঁত ব্রাশ করে খেতে বসতে হল। এসব কাজ কোনোটাই রূপুর মনোমত নয়, কিন্তু আয়াদিদি নাছোড়বান্দা। ব্রেকফাস্ট খেতে বসেই দেখল এক প্লেট পরিজ! চোখে জল এসে গেল রূপুর। এই অখাদ্য সুজির পরিজ রোজ রোজ কেউ খেতে পারে!

'আবার পরিজ! আর কিছু নেই?' রূপু বলল একটু বিরক্তির সঙ্গেই। আয়াদিদি বলল, 'আগে পরিজটা খেয়ে নাও। টোস্ট আর ডিম দিচ্ছি।'

ভুরুটা কুঁচকেই রইল রূপুর, 'মা কই? আজ তো অফিস নেই। তবে?' বলতে বলতেই মা হাজির। 'দুষ্টুমি করো না, খোকন। খেয়ে নাও।' বলে মা রূপুকে জড়িয়ে ধরে কপালে একটা চুমু খেলেন। দারুণ ভালো লাগছিল রূপুর। মায়ের গায়ে কী সুন্দর গন্ধ। দেখতেও দারুণ লাগছে। 'একটা মিটিং আছে, বাবা। সেরে আসি। লক্ষ্মী হয়ে থেকো। আয়াদিদিকে বিরক্ত করো না। বিকেলে মামার বাড়ি যাব।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল মা। বলেই আরেকটা চুমু খেয়ে টাটা বলে বেরিয়ে গেল। তখ্খুনি গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ পেল রূপু।

মামার বাড়ি যেতে বেশ ভালোই লাগে রূপুর। সেখানে মামা-মামী ছাড়াও ছোট্ট বিজু আছে, আর আছে ছোট্ট কুকুরটা। তবু ছুটির দিনের সকালটা যেন বিচ্ছিরি হয়ে গেল মুহূর্তেই। মা যেন কী? সারা সপ্তাহ অফিস যায় তো, আবার শনিবারেও মিটিং! কিচ্ছু ভাল্লাগে না, ভাবতে ভাবতে রূপু দু-চার চামচ পরিজ চালান করে মুখের মধ্যে। নইলে আয়াদিদি ছাড়বে নাকি! ততক্ষণে ডিম আর টোস্ট-মাখন নিয়ে আয়াদিদি হাজির। 'ওকি, খাওনি এখনো?' অগত্যা রূপু তাড়াতাড়ি মুখ চালায়।

খাওয়া শেষ করতেই আয়াদিদি প্লেট-টেট নিয়ে রান্নাঘরে গেল, বলে গেল 'ভালো করে কুলকুচি করবে কিন্তু, নইলে দাঁতে পোকা হবে।' এই এক বিপদ! ঘণ্টায় ঘণ্টায় মুখ ধুতে হবে, কুলকুচি করতে হবে, দাঁত মাজতে হবে। নইলে নাকি দাঁত খারাপ হবে! কেউ কখনও শুনেছে এমন কথা? স্কুলে ওর বন্ধুরা চাঁদ, জয়, মুন্না সব্বাই হাসছে। আচ্ছা, কুকুর-বেড়ালদের কেউ কখনও দাঁত মাজতে দেখেছে? ওদের কী সুন্দর ঝকঝকে দাঁত!

কুকুর-বেড়ালের কথা ভাবতেই আবার কান্না এল রূপুর। অবশ্য ঢোঁক গিলে ফেলল তখ্খুনি। বড় হয়ে গেছে না? আর কাঁদা ভালো দেখায় না। ওর বন্ধু জয় আর মুন্নার কি সুন্দর কুকুর আছে, গেলেই ল্যাজ নাড়ে আর চাটে। জয়েরটা ডাশহুন্ড আর মুন্নাদের গোল্ডেন রিট্রিভার। চাঁদ পুষেছে একটা ছোট্ট বেড়াল-ছানা, সে রাত্রে চাঁদের বিছানায় শোয়। আর রূপুর? তাদের বাড়িতে কুকুর-বেড়ালের প্রবেশ নিষেধ।

না, রূপুর মাও কুকুর-বেড়াল ভালোই বাসেন। তবে? আসল কারণটা হল আয়াদিদি। আয়াদিদি দুচোখে জন্তু-জানোয়ার দেখতে পারে না, খালি বলে 'নোংরা জীব, অসুখ-বিসুখের ডিপো।' আর মা বলেন, 'আয়াদিদিকে কষ্ট দেবে না। ও কত ভালোবাসে তোমাকে। ওর আর আছেই বা কে?' সুতরাং... সুতরাং এবাড়িতে কুকুর-বেড়াল ঢোকা বন্ধ।

আয়াদিদি যে রূপুকে খুব ভালোবাসে, তা রূপুও জানে। কিন্তু রূপুর সারাদিন কাটে কী করে? স্কুল থেকে তো ও ফেরে দুপুর বারোটায় আর মা ফেরেন সেই সন্ধ্যা সাতটায়। সপ্তাহে তিনদিন ও অ্যান্ডারসন ক্লাবে সাঁতার শিখতে যায়। সেখানে সাব-জুনিয়ার বিভাগে ও বেশ নামও করে ফেলেছে। একদিন পাড়ায় কবিতা আবৃত্তির ক্লাস। আবৃত্তি ও ভালোই করে, নিজে নিজেও ছড়া বানাতে পারে। এছাড়া শনি-রবিবার সকালে আছে লেকের মাঠে চারটে সি অর্থাৎ ক্যালকাটা ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে প্র্যাকটিস। সেখানে অশোক স্যার, রীতেন স্যার দুজনেই বলেছেন 'ভালোই হচ্ছে, কিন্তু চাই প্র্যাকটিস, আরও প্র্যাকটিস।' এসবে সে বেশ ব্যস্ত থাকে বটে, কিন্তু বাড়ি ফিরে মাকে না দেখলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়।

বিকেলে খানিকক্ষণ ও সামনের পার্কটায় খেলে, ওখানে মুন্নাও আসে— কখনও কখনও সঙ্গে ড্যানিও থাকে, ড্যানি ওদের কুকুরটা। বেশ মজা হয়! অবশ্য রূপু কুকুরের চেয়ে বেড়ালই বেশি পছন্দ করে, বিশেষত বেড়াল-বাচ্চা। একবার রূপু ওদের বাগানের সামনেই একটা ছোট্ট বেড়ালের বাচ্চা দেখেছিল, তার গায়ে বাঘের মতন ডোরা কাটা। ওর জ্যাকেটের নীচে লুকিয়ে ওর ঘরে কাবার্ডের কোনায় রেখেছিল। সে রাতে কিছুটা কন্ডেন্সড মিল্ক খাইয়ে চালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালেই আয়াদিদি আবিষ্কার করে ফেলল টাইগারকে। প্রথমে 'ইঃ' বলে একটা চিৎকার করে উঠল। তারপর ওর ঘাড়ের পিছনে দু-আঙুল দিয়ে আলগোছে ধরে ওকে ছুঁড়ে ফেলল চৌকাঠের বাইরে। তারপর আবার বেশ জোরে বলল 'অ্যাঃ'। বাচ্চাটা বেশ করুণভাবে 'মিঁয়াও' বলতেই আবার ঝাঁটা হাতে তেড়ে গেল সেই দিকে। বাস্, সেই প্রথম আর সেই শেষ। সারাদিন আয়াদিদি গজগজ করতে লাগল। মা পর্যন্ত রূপুকে কি রকম বকা-ঝকা করলেন। বাচ্চাটার কথা কেউ ভাবল না!

এবার বাবা ফিরলে একটা শেষ চেষ্টা করতে হবে। আরে, একথাটা আগে মনে আসেনি তো! ওর বাবা কিছুটা অন্যরকমের মানুষ। ওকে কখ্খনো খোকন বলে ডাকেন না, কখনও বলেন ওল্ড ম্যান, কখনও বলেন বস্, কখনও বা ছোট সাহেব। সে বাবার মর্জির উপরে। আসলে ওর বাবা তো এখানে প্রায় থাকেনই না। বছরে দু-মাস ছুটিতে আসেন। বাবা কাজ করেন আর্মিতে। ক্যাপ্টেন এ. কে. চক্রবর্তী বলেই সবাই চেনে বাবাকে। বাবার বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। সবাই বলে রূপুর মুখ নাকি বাবার মতন। কে জানে বাবা! অনেকবার আয়নাতে খুঁটিয়ে দেখেও রূপু কিছু বুঝতে পারেনি। বড়োদের অনেক ব্যাপারই এরকম, বোঝা শক্ত।

এই যেমন বাবার ঠিকানা! সকলেরই ঠিকানা জানা আছে, রূপুরা যেমন থাকে ১৬ নম্বর লেক রোডে। কিন্তু ওর বাবার কোনও ঠিকানা নেই। এমন কি, বাবাদের ব্যাটালিয়ন কোথায় আছে— সিকিম, আসাম, ত্রিপুরা না

নাগাল্যান্ড তাও জানা নেই। বাবাকে চিঠি লিখতে হলে কেবল লিখতে হয়— ক্যাপটেন এ, কে, চক্রবর্তী; কেয়ার অফ নাইন্টি-নাইন এ, পি, ও। এ আবার কিরকম ঠিকানা? বাবাকে বললেই খালি হাসেন আর বলেন, 'আর্মিতে সবই টপ-সিক্রেট!'

বাবার কথা ভাবতেই মনটা একটু হাল্কা হল। আর তখনই ব্যাপারটা ঘটলো। আয়াদিদি রান্নাঘরে, মা বেরিয়ে

গেছেন, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রূপু দেখল উল্টোদিকের ফুটপাথে একটা ছোট্ট ছাই রঙের বেড়ালছানা। এ তল্লাটের প্রায় সব বেড়ালকেই রূপু চেনে। ওদের উল্টোদিকের বাড়িতে দুই বুড়ি থাকে— তাদের আছে দুটো আহ্লাদী সাদা-কালো বেড়াল, বাড়ি ছেড়ে বেরোয় না, তবে জানলায় রোদ পোয়ায়। মোড়ের বাড়িতে আছে একটা পাটকিলে রঙের বেড়াল— সে সারাদিন সারা পাড়া চষে বেড়ায়, রাতে বাড়ি ফেরে। ২৪ নম্বর বাড়িতে একটা ধবধবে সাদা বেড়াল আছে, সেও খুবই আদুরি। এছাড়াও অবশ্য বেশ কয়েকটা রাস্তার বেড়াল আছে। তাদের সর্দার একটা বড় কালো হুলো। সেটা এক চোখে কাণা, তার বেশ বদ-মেজাজি। রাত্তিরে গলা ফুলিয়ে 'ওয়াঁও' ডেকে গলা সাধে। আয়াদিদি বলে ও নাকি মাছ চুরি করে। রূপুর বেশ ভয়ই লাগে হুলোটাকে। কিন্তু এ তল্লাটে কোনও ছাই রঙের বেড়ালবাচ্চা কোনওদিন তো দেখেনি রূপু। ওদের পাশের রাস্তায় একটা ছাই রঙা বেড়াল আছে, তারই বাচ্চা নাকি?

এবার দেখল বৃষ্টিতে ভিজে বাচ্চাটা বেশ কাবু, চোখ রূপুর দিকে তাকিয়ে যেন করুণ কণ্ঠে বলল 'মিঁয়া-আ-উ'। ওর বেশ কষ্ট হচ্ছে। অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই রূপু দৌড় দিল রাস্তার দিকে আর তখনই ব্যাপারটা ঘটল। ঘোঁ-ঘড়-গড়, ভোঁয়াকে-ভোঁয়াক, ঘ্যাঁশ, দুড়ুম, হৈচৈ, 'গেল গেল' চিৎকার।

কি গেল না বুঝলেও রূপু বুঝেছিল ওর বেশ লেগেছে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে দেখল একটা ছোট লরি, তখুনি মোড় ঘুরে এসেছে। ব্রেক কষে দাঁড়িয়েও গেছে। তার সামনে একটা ছোটোখাটো জটলা। আয়াদিদি কাঁদছে। পাশের বাড়ির ঘোষজেঠু মোবাইলে ফোন করছেন মাকে। সবাই মিলে ধরাধরি করে কাকে যেন ওদের

বসবার ঘরে সোফায় শুইয়ে দিল। ৩৬ নম্বরের ডাক্তারকাকুও এসে গম্ভীর মুখে কিসব যেন বলছেন। দেখতে দেখতে মা ফিরে এলেন, একটা অ্যাম্বুলেন্সও এসে গেল। কাকে যেন নিয়ে চলে গেল অ্যাম্বুলেন্সটা। পাড়ার লোকে বলাবলি করছিল, 'অ্যাক্সিডেন্ট— খোকন— অ্যাম্বুলেন্স— উডল্যান্ড্স'।

কাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে? খোকনকে? কিন্তু খোকন তো এই এখানে! ব্যাপারটা বোঝবার জন্য রূপু রাস্তা পেরিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে যেতেই ওদের পাশের বাড়ির দারোয়ান ওকে বলল, 'হুস, পালা, পালা'! দারোয়ানজিকে বিরাট বড় লাগছিল। বেশ ভয়ই করছিল রূপুর। কাকে তাড়াচ্ছে সে?

হকচকিয়ে দু-পা পিছিয়ে যেতেই রূপুর নজর পড়ল রাস্তার ধারের নর্দমায়, বৃষ্টির জলে নর্দমাটা বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। সেদিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল রূপু, এ কী দেখছে সে? নর্দমার জলে আয়নার মতন সে বেশ স্পষ্ট দেখল লম্বাটে মুখ, সরু লম্বা চোখ, গোলাপী নাক, সাদা লোমে সারা শরীর ঢাকা আর একটা বেশ পুরুষ্টু ল্যাজ! এ কার চেহারা? রূপু কি তাহলে একটা সাদা বেড়াল হয়ে গেল নাকি!

দুই : বাড়ি থেকে পালিয়ে

ফুটপাথের একপাশে দাঁড়িয়ে রূপু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। কেমন যেন ভয় ভয় করছে ওর। অ্যাম্বুলেন্সটা চলে যেতেই ভিড়টা বেশ পাতলা হয়ে এল। ওদের বাড়ির ফুটপাথ দিয়ে তিন-চারটে ছেলে হৈ হৈ করতে করতে গেল, রূপুর মনে হল যেন দৈত্যের মতন চেহারা ওদের। তখ্খুনি ভীষণ শব্দ করতে করতে একটা বড় গাড়ি গেল, মনে হল গাড়িটা বাড়ির থেকেও বড়। রাস্তা থেকে কাদা জল ছিটকে লাগল রূপুর গায়ে। রাস্তাটা একটু ফাঁকা হতেই রূপু এক দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে দাঁড়াল ওদের ১৬ নম্বর বাড়ির সামনে।

আয়াদিদি সদর দরজার পাশে জানলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। রূপু তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দরজাটা খুলে দাও না, আয়াদিদি। আমি রূপু। কেমন করে জানি বেড়াল হয়ে গেছি!' অমনি আয়াদিদি চেঁচিয়ে উঠল, 'ও মা! এতো সেই নোংরা সাদা বেড়ালটা। দাঁড়া তো, ঝাঁটাটা নিয়ে আসি। ঝাড়ু মেরে বিদায় করব।' রূপুর বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল। আয়াদিদি তাকে এত ভালোবাসতো, সেও রূপুকে চিনতে পারল না। আর দাঁড়াল না রূপু। পা চালাল হনহন করে। কিন্তু যাবেই বা কোথায়?

এ যেন অন্য এক কলকাতা। পায়ে পায়ে চলতে চলতে রূপু এসে গেছে ল্যান্সডাউন রোডে। এবার সে বাঁয়ে মোচড় মেরে চলল লেকের দিকে। এ তার জানা রাস্তা, কিন্তু এখন এ পথ চলা বেশ বিপজ্জনক। জলে-কাদায় তার সুন্দর সাদা লোম মাখামাখি হয়ে গেছে। রাস্তায় মাঝে মাঝেই খানাখন্দ, জলে ভরা গর্ত। সেসব এড়িয়ে যদিওবা চলা যায় তো পায়ের ভয়! অনবরত রূপু দেখছে জোড়ায় জোড়ায় পা— কেউ চটি পরা, কেউ বা কাবলি, কেউ আবার বুট! পায়ের মালিকদের প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, কিন্তু ভয়তো ঐ পাগুলোকেই। একথা ভাবতে না ভাবতেই একটা বুট জুতো মাড়িয়ে দিল তার ল্যাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে এক গর্জন, 'এঃ বেড়ালটা পায়ে পায়ে জড়াচ্ছে। প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম আর কি!' ল্যাজ মাড়ানোর যন্ত্রণা যে কি তা, যে সহ্য করেনি সে বুঝতেই পারবে না। তবু একটু সামলে নিচ্ছিল রূপু, তখুনি তার বাঁ পাঁজরে সজোরে লাগল একটা সবুট লাথি। প্রায় তিন গজ দূরে ছিটকে পড়ল রূপু।

আর একটু এগোতেই কে যেন দোকান থেকে এক টিন ময়লা উপুড় করে দিল তার গায়ে। একটু পরেই একটা ছেলে ঢিল মারল রূপুকে। বার বার এই সব ঘটনায় বেশ ঘাবড়িয়ে গেল রূপু। ছুটতে আরম্ভ করল পাঁই পাঁই করে। কিন্তু ছুটছে কি পায়ের ভয়ে না ঢিল খাওয়ার ভয়ে না গাড়ির ভয়ে তা ঠিক বুঝতেই পারল না।

যাই হোক, এক দৌড়ে সে পৌঁছে গেল লেকের মাঠে। বৃষ্টির জন্য লেক প্রায় ফাঁকা। একটা গাছের তলায় একটু বিশ্রাম নিল রূপু। তার ছেলেবেলায় (অর্থাৎ যখন সে ছেলে ছিল তখন) বৃষ্টিতে ভিজতে বেশ ভালোই লাগত তার। কিন্তু এখন লোমগুলো ভিজে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে, ধুলো-ময়লা লেগে আছে, পায়ের থাবার তলাগুলো ভিজে গেছে, বেশ ঠান্ডা লাগছে তার।

এখন যায় কোথায়? রাস্তায় তো আবার সেই গাড়ির চাকা আর পায়ের বুটের ভয়। কোনও মতে লেকের

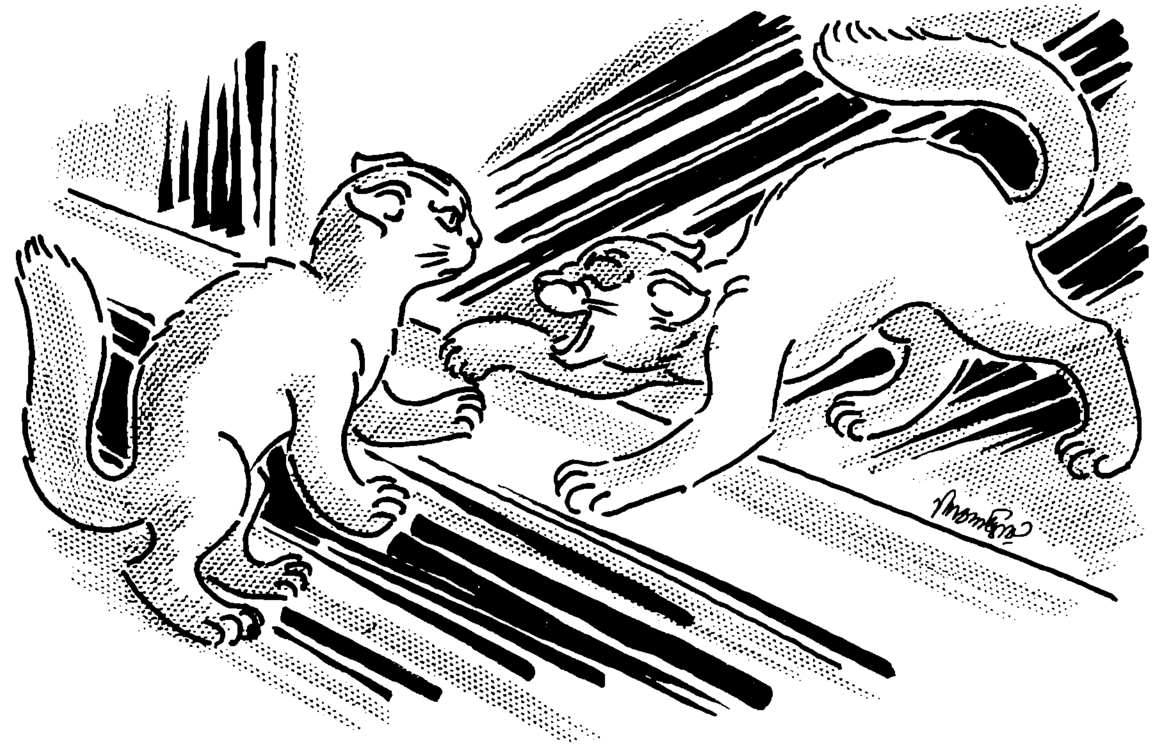

ধার ঘেঁষেই চলল রূপু, শরীর আর টানছে না। খিদেও পেয়ে গেছে ভীষণ। বাড়িতে আয়াদিদি ঘড়ি দেখে খাবার ধরে দিত সামনে। তখন বেশ বিরক্তি লাগত। আর এখন? যদি এক গেলাস দুধ পাওয়া যেত! গা-হাত-পা ধুয়ে মুছে, দুধের গেলাসে চুমুক দিয়ে, খাটে পা মুড়ে শুয়ে একটা নডি-র বই বড়ার কথা ভাবতেই রূপুর আবার চোখে জল এল।

একটা গ্যারেজে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার চলতে লাগল রূপু। তখন বিকেল হয়ে গেছে। কোনদিকে যে যাবে? ট্রাম রাস্তায় পড়ে সে উত্তরে চলল। বড় রাস্তায় বড্ড ভিড়, তাই বড় রাস্তা ছেড়ে ভিতরের রাস্তা ধরল। এসব রাস্তা চেনে না সে। তবে না চিনলেই বা কি? তাতে কোন অসুবিধা নেই কারণ সেতো জানেই না কোথায় যাচ্ছে!

সন্ধ্যার মুখে রূপুর শরীর প্রায় ভেঙে পড়ে আর কি! এ রাস্তাটা বেশ নিরিবিলি। সামনেই একটা গ্যারেজ, তার কোলাপ্‌সিবল গেটের ফাঁক দিয়ে ঢুকে একটু বিশ্রাম করছে রূপু। তখনই শুনল 'অ্যাও! তুই আবার কে?' অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল একটা কান ছেঁড়া হলদে হুলো তার দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বলছে আর রূপু বেশ বুঝতেও পারছে তার কথা। 'আমি রূপু' বলতে না বলতেই খেঁকিয়ে উঠল হুলোটা, 'অ্যাঁঃ রূপু! যা, ভাগ এখান থেকে, এটা আমার জায়গা।' বেশ ভয় পেল রূপু, কিন্তু সে যে বড় ক্লান্ত— তার হাঁটতেও পারছে না। 'ফ্যাঁশ' বলে ধমকে হুলোটা যেন নিজের শরীরটা ফুলিয়ে ডবল করে ফেলল, তার চোখ দুটো জ্বলছে! শরীরটা টান টান করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল রূপুর ওপর, মুখের উপর পড়ল একটা থাবার আঁচড়। কিন্তু রূপুর আত্মরক্ষা করার শক্তিও নেই। এবার তার টুঁটি কামড়ে ধরে এক ঝটকায় হুলোটা তাকে বাইরের রাস্তায় ফেলল। এবার বোধহয় সে মরেই যাবে। অ্যাক্সিডেন্টে নয়, হলদে হুলোর হাতে এই মৃত্যু কেউ জানতেই পারবে না।

মা গো! দুচোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল রূপুর। *(ক্রমশ)*

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

[বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

গল্পসল্প

রেবন্ত গোস্বামী

আজ থেকে ষাট বছর আগে ছোটোদের সাহিত্য নিয়ে যাঁরা ভাবনাচিন্তা করতেন, তাঁরা কোলকাতায় যে সংস্থাটির পত্তন করেছিলেন, সেই 'শিশু সাহিত্য পরিষদ'-এর গল্প তোমাদের করছি। তাঁদের অনেকের সঙ্গে 'সন্দেশ'-এর সম্পর্ক এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, সন্দেশের জন্য আর আলাদা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হত না। অনেকের কথাই তোমাদের শুনিয়েছি। আরও তিনজন প্রয়াত-ব্যক্তির গল্পই আজ করব। এঁদের মধ্যে মাত্র একজনই কোনও কারণে সেই সময় সন্দেশ কেন, কোনও পত্রপত্রিকার সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতেন বলে মনে হয় না।

প্রথমেই মনে পড়ে ডা. ননীগোপাল মজুমদারের কথা 'ডাক্তারবাবু' নামেই যিনি পরিচিত ছিলেন। প্রখ্যাত শিশুচিকিৎসক ছিলেন। তাঁর ভবানীপুরের চেম্বারে যে বিরাট মোটা মোটা বাঁধানো খাতা থরে থরে সাজান থাকত, তাতে কী লেখা থাকত জানো? বর্ণানুক্রমে প্রতিটি রোগীর নাম আর রোগ ও ওষুধের বৃত্তান্ত! ডাক্তারবাবু চিলড্রেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একজন কর্মকর্তা ছিলেন। সেই বিষয়েই ''শিশুকল্যাণ'' নামে একটি বাংলা পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। তার সঙ্গেই লিখতেন ছোটোদের জন্য গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ। শরীর ও মন দুয়েরই স্বাস্থ্য নিয়ে ছিল তাঁর কারবার। শুনেছি, স্বাধীনতার বেশ আগে ''রত্ননেশা'' নামে তাঁর একটি বই দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল।

ডাক্তারবাবু, ছাত্রাবস্থায় লীলাদির বাড়িতে প্রায়ই যেতেন। কারণ, লীলাদির বাড়িতে প্রচুর গল্পের বই ছিল। লীলাদি শুনে অবশ্য মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'ননী নিশ্চয়ই বইয়ের আকর্ষণেই আসত। তবে কিছু না খেয়ে চলে গেলে পাছে আমি কিছু মনে করি, তাই বোধহয় এসেই খোঁজ করত নতুন কী খাবার বানিয়েছি।'

তবে ডাক্তারবাবুর একটা বড় কাজই সম্পূর্ণ হল না। সেটা ছোটোদের জন্য একটি বিশ্বকোষ অভিধান ''শিশুভারতী'' রচনা। মাত্র দুই খণ্ড হয়েছিল!

ডাক্তারবাবু ছাড়া পরিষদে— নিয়মিত আসতেন দুই চক্রবর্তী। দুজনেই ছিলেন দিকপাল চিত্রশিল্পী। তাঁরা হলেন— পূর্ণচন্দ্র এবং শৈল।

প্রথমজনের কাজের প্রকৃত মূল্যায়ণ আজও হয়েছে কিনা, জানা নেই। সাধারণের কাছে তিনি প্রায় বিস্মৃত। ছোটোরা তাঁকে জানে ''ছবিতে রামায়ণ'' আর ''ছবিতে মহাভারত''-এর তাঁর চিত্রাঙ্কনের জন্য। বাণিজ্যিক কাজ ছাড়া তিনি কেন যে অন্য জায়গা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন তা আমার জানা ছিল না। শুনেছি, তাঁর সৃজন মূলক বেশ কিছু অসাধারণ চিত্র সম্ভারও আছে।

আর শৈলদার নাম করলে তোমাদের হয়তো সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে আরেক চক্রবর্তীকে — শিরবাম। শিবরামের গল্পে লেখকের সেই সুপরিচিত চেহারা দ্বিতীয় কোনও শিল্পীর রেখায় দেখেছ কি? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পে ইলাসট্রেশনের দায়িত্ব পাওয়ার গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন শৈল চক্রবর্তী তরুণ বয়সেই। শৈলদা ছোটোদের জন্য প্রচুর গল্পও লিখেছেন। মজার কবিতাও কেমন লিখতেন, তার নমুনা তো সেরা সন্দেশেই আছে— ''ভূতের ওঝা''।

এছাড়াও ছোটোদের সাহিত্যজগতের বাইরের অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে হাজির হতেন শিশুসাহিত্য পরিষদের শনিবারের বৈঠকে - নিছক আড্ডার লোভে। ডাক্তারবাবু তো বলতেনই—

'শনিবারের বৈঠকে
যে না আসে, সেই ঠকে।'

ধাঁধা

জটা পাগলার সমস্যা

সমস্যা — ১

সেদিন অশ্বডিম্বপুর বাজারের পাশে কূর্মগতি কুরিয়ারের অফিসের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনি ভেতরে বেজায় গণ্ডগোল। ভেতরে ঢুকে দেখি মালিক অলম্বুষ আঢ্য তার এক কর্মচারী গতিময় গড়াইকে প্রচণ্ড ধমক-ধামক দিচ্ছেন। কান খাড়া করে পুরো ব্যাপারটা শুনলাম। হয়েছে কি— তিনটে টিনের কৌটো এই কুরিয়ারের মাধ্যমে যাবে আরেক শহরে। একটা কৌটোয় রয়েছে রসগোল্লা, একটা কৌটোয় পান্তুয়া আর আরেকটা কৌটোয় রসগোল্লা ও পান্তুয়া দুটোই। তিনটে লেবেলও তৈরি ছিল। প্রথমটাতে লেখা ছিল রসগোল্লা, দ্বিতীয়টাতে পান্তুয়া ও তৃতীয়টাতে রসগোল্লা-পান্তুয়া। গতিময় প্রত্যেকটা কৌটোতেই ভুল লেবেল লাগিয়েছে। প্রচুর ধমক খেয়ে গতিময় মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'একটা সুযোগ দিন স্যার। কৌটোগুলো সব একবার খুলে ভেতরে দেখে ঠিক ঠিক লেবেল লাগিয়ে দিচ্ছি।'

গর্জে উঠলেন অলম্বুষবাবু, 'ঠিক আছে। মাত্র একটা কৌটো খুলে তার থেকে মাত্র একটা মিষ্টি তুলে সেটাকে মাত্র একবার দেখতে পারবে।'

করুণ মুখে গতিময় বলল, 'তাহলে সব লেবেল কীভাবে ঠিক ঠিক লাগাব?'

আমার দিকে বাঁকাচোখে তাকিয়ে অলম্বুষবাবু বললেন, 'ওই তো জটা পাগলা দাঁড়িয়ে আছে। ও নাকি সবার সব সমস্যার সমাধান করে দেয়। দেখ তোমাকে সাহায্য করতে পারে কিনা।'

গতিময়কে আমি সাহায্য করেছিলাম। তোমরা কি পারবে?

সমস্যা — ২

আমি যে ভিনগ্রহ থেকে এসে এখানে আটকে আছি সেটা অশ্বডিম্বপুরের বড়রা কেউ বিশ্বাস করে না। তোমাদের বয়সীরা অবশ্য সবাই আমার কথা বিশ্বাস করে, আমাকে ভালোওবাসে। এইতো কিছুক্ষণ আগে লক্ষ্মীছাড়া ক্লাবের সব খুদেরা এসে আমাকে বলল, 'জটুদা, কাল আমাদের পিকনিক, তোমাকেও যেতে হবে।' আমি বললাম, 'চাঁদা কত?' ওরা বলল, 'চাঁদা লাগবে না। পটুদা বলেছে পুরো পিকনিক ও স্পনসর করবে যদি ওর পোলট্রিতে কটা মুরগী আর গোয়ালে কটা গরু অছে সেটা আমরা বলতে পারি।' আমি বললাম, 'কোন ক্লু দেয়নি?' ওরা বলল, 'দিয়েছে। বলেছে মাথা আছে ৪০টা, পা আছে ১০৮।'

পরের দিনের পিকনিক পটুই স্পনসর করেছিল, কারণ উত্তর ও পেয়ে গেছিল। তোমরা কি ধরতে পেরেছ?'

সমস্যা — ৩

তাক তেরে কেতে তাক নগরীর কাস্টমস অফিসার বেতাল ভট্টর সামনে ওর সেপাইরা পাঁচজনকে এনে হাজির করেছে। বেতাল ভট্ট আড়মোড়া ভেঙে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের পরিচয়?'

একজন বলল, 'আমার নাম গজা। আর এরা হল ভজা, পচা, পোনা আর ধনা। খোল, ঢোল, বাঁশি আর সানাই নামে চারটে বাদ্যযন্ত্র তৈরির দোকান আছে সুরলহরী শহরে। আমরা সেগুলোর মালিক।'

বেতাল ভট্ট কাগজ কলম খুলে বলল, 'কে কোন দোকানের মালিক?'

গজা বলল, 'আমি আর ভজা একটা দোকানের যুগ্মমালিক। খোল আর সানাই-এর মালিকের নাম প দিয়ে শুরু। ঢোল-এর মালিক একজনই। পচা যে দোকানের মালিক তার নাম খোল নয়।'

বেতাল ভট্ট ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাকিয়ে রইল। তা, তোমরা একটু বেতালকে সাহায্য কর না।

শব্দ নিয়ে খেলা

এই খেলায় একটা শব্দকে বদলে দিতে হবে অন্য একটা শব্দে। শব্দ বদলের নিয়মটা হল, প্রত্যেক পরিবর্তনে তুমি হয় একটি বর্ণ কিংবা বর্ণের সঙ্গে যুক্ত আ-কার, ই-কার, উ-কার ইত্যাদি মাত্রাগুলি বদলাতে পারবে। মনে রেখ প্রতিটি পরিবর্তিত শব্দের কিন্তু একটা নিজস্ব অর্থ থাকতে হবে। যেমন, যদি বলা হয় 'বই'কে 'খাতা' করো, তাহলে এরকম করতে পারো, 'বই' > 'খই' > 'খত' > 'খাত' > 'খাতা'। কেমন, পরিষ্কার?

এবার এইভাবে, **তামাকে** '**সোনা** বানাও আর **পালক** কে **কলম** বানাও তো।

ছবির ধাঁধা

ভয়ঙ্কর দুষ্টু খুস্বু রাজার কেল্লায় বাঘার ঢোল গেছে হারিয়ে! ভুতের রাজার কাছে উপহার পাওয়া ভুতের একপাটি তাড়াহুড়োয় গেছে কোথায় কে জানে। প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে ঢোলের সন্ধান পেলেও পৌঁছুবার পথের হদিশ করা যাচ্ছে না। দেখ তো তোমরা গুপি-বাঘাকে সাহায্য করতে পারো কিনা? তীর আঁকা আছে কেল্লার ভেতরে ঢোকার দরজায়। তারপর তোমার কেরামতি।

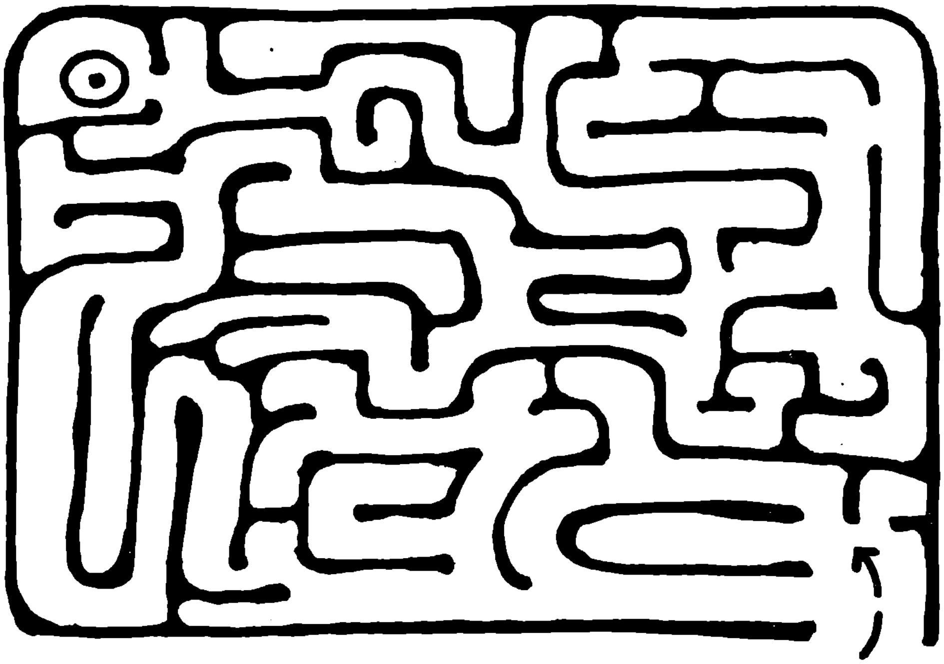

সন্দেশীরা, 'জটা পাগলার সমস্যা', 'শব্দ নিয়ে খেলা' আর 'ছবির ধাঁধা'র উত্তরগুলো চটপট পাঠিয়ে দাও সন্দেশের দপ্তরে। সঙ্গে নিজের নাম, বয়স আর গ্রাহক সংখ্যা লিখতে ভুলো না যেন (সতেরো না-পেরনো গ্রাহকেরা শুধু অংশ নিতে পারবে)। সফল উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশিত হবে পৌষ ১৪১০ সংখ্যায়। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ নভেম্বর মাসের ৩০।

গ্রেগ, মারাদোনা, পেলেরা

জয়ন্ত চক্রবর্তী

কয়েকজন বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়ের মুখোমুখি হওয়ার গল্প শোনাই আজ। পেশাগত সুবিধার কারণেই দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে এঁদের মুখোমুখি হয়েছি। উপভোগ করেছি সান্নিধ্য। কারও কারও সঙ্গে পরিচয় নিবিড়ও হয়েছে। পেশার বাইরেও যোগাযোগ থেকে গিয়েছে।

টনিগ্রেগের নাম কে না জানে। ইংল্যান্ডের ক্রিকেট অধিনায়ক বিখ্যাত ছিলেন তাঁর চমকপ্রদ দৈর্ঘ্যের জন্য। ইংল্যান্ডে টনি গ্রেগের আগে একজন ক্রিকেটার ছিলেন, নাম ডেভিড লারটার, তাঁর দৈর্ঘ্য এমনই ছিল যে, তিনি যখন ভারত সফরে এসেছিলেন তখন কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে তাঁর জন্য বিশেষ খাটের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। টনি গ্রেগের বেলাতেও তাই হয়েছিল। ওবেরয় গ্র্যান্ড কর্তৃপক্ষ গ্রেগের জন্য বিশেষ ধরনের লম্বা খাটের ব্যবস্থা করেছিল। তা এই গ্রেগের সঙ্গে খাতির জমে গেল হঠাৎই। দিনটা ছিল ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৬। গোটা কলকাতা বড়দিনের আনন্দে মত্ত। হঠাৎই খবর পেলাম, ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলটি গুয়াহাটিতে পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে তিনদিনের ম্যাচটি খেলতে যাওয়ার আগে কলকাতায় বড়দিন কাটাচ্ছে। সেবার কলকাতায় টেস্ট ম্যাচ ছিল জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। অর্থাৎ টেস্ট ম্যাচ খেলতে আসার আগেই গুয়াহাটি যাওয়ার ফলে গ্রেগরা কলকাতায়। ছুটে গেলাম গ্র্যান্ডে। দেখি সাহেবদের দল সেজেগুজে টালিগঞ্জ ক্লাবে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। চারপাশে তারকা ক্রিকেটাররা গিজ্‌গিজ্ করছে। জন লিভার, বব উইলি, এডরিচ, ম্যানেজার কেন ব্যারিংটন। সংবাদপত্রের লোক বলতে আমি আর ব্রিটিশ প্রেসের কয়েকজন ছিলেন। তাঁদের একজন অ্যালান লি'র সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। লি'কে বললাম, টনি গ্রেগের একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাই। অ্যালান লি কথাটা গিয়ে বললেন টনি গ্রেগকে। গ্রেগের মনটা বোধহয় ভালো ছিল। সরাসরি আমন্ত্রণ জানালেন টিম বাসে। ওঁর পাশের আসনে বসে টলি ক্লাবে পৌঁছনোর সময়ের মাঝখানে সাক্ষাৎকার নিতে পারি। কথাটা শুনে আমার তো তখন হাতে স্বর্গ পাওয়ার মত অবস্থা। ব্যাপারটা হলও তাই। টিমবাসে গ্রেগের পাশে আমি। সাক্ষাৎকার নেব কী! গ্রেগকে কলকাতা চেনাতে চেনাতেই আমার সময় চলে গেল। টালিগঞ্জ ক্লাবে যখন পৌঁছলাম তখন আমার নোটবইতে একটা কালির আঁচড়ও পড়েনি। গ্রেগ বললেন— তুমি টলি ক্লাবে চলো। ওখানে ইন্টারভিউ নেবে। টলি ক্লাবের কর্তা বব রাইট (মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' ছবিতে অভিনয় করেছেন) আমাকে ঘটা করে আমন্ত্রণও করে ফেললেন। ক্লাবের রেজিস্টারে আমার নামের পাশে লেখা হয়— গেস্ট অফ টনি গ্রেগ, ক্যাপ্টেন, ইংলিশ ক্রিকেট টিম। ক্লাবে ঢুকে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা মেতে উঠলেন গলফ আর নানা খেলা নিয়ে। টেবিলে টেবিলে স্নাক্স আর নানারকমের পানীয়। তার মধ্যে বসে গ্রেগ ইন্টারভিউ দিলেন। শোনালেন নানা কাহিনী। চারদিন 'যুগান্তর' এর পাতায় সেই দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। এক্সক্লুসিভ।

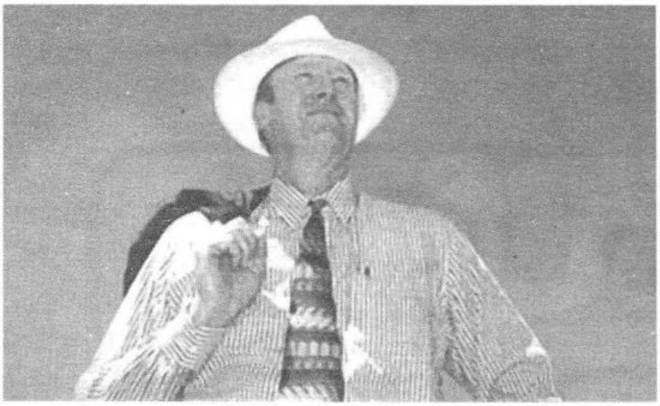

গ্রেগের সঙ্গে আমার আলাপটা কিন্তু থেকেই গেল। এখনও আমি টনি গ্রেগকে নিয়ম করে ক্রিসমাসের কার্ড

পাঠাই। টনি গ্রেগও পাঠাতেন। কয়েক বছর আর পাচ্ছি না। চার বছর আগে বিশ্বকাপের সময় ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল লর্ডসে। উনি মনে রেখেছেন। বড়দিনের সেই উষ্ণ সকালের কথা। আমিও কি ভুলেছি?

যেমন ভুলিনি দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনার কথা। মারাদোনাকে যখন প্রথম দেখি, রোম থেকে ছাব্বিশ কিলোমিটার দূরে, পাহাড়ি টিলার ওপর অবস্থিত ট্রেগোরিয়াতে আর্জেন্টিনার প্রস্তুতি শিবিরে। ১৯৯০ সালে বিশ্বকাপের সময়। আর্জেন্টাইন দলটি কার্লোস বিলার্ডোর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করেছিল মাঠে। মারাদোনা মাঠের ধারে একটা বলের ওপর বসেছিলেন। পায়ে চোট, তাই প্র্যাকটিসে নামেননি। এক আর্জেন্টাইন সাংবাদিকের মাধ্যমে পরিচিত হলাম মারাদোনার সঙ্গে। ভেবেছিলাম যে মারাদোনা হয়তো পাত্তাই দেবেন না ভারতীয় সাংবাদিককে, কারণ ভারত তো বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে কোথাও নেই। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম যে, মারাদোনা আগ্রহ নিয়ে আমার সমস্ত প্রশ্ন শুনলেন। উত্তর দিলেন। পাল্টা প্রশ্নও করলেন। বুঝলাম যে, বড় হয় যে, সে সর্ব অর্থেই বড় হয়। উত্তরপর্বে মারাদোনাকে আরও কয়েক বছর দেখেছি কাছ থেকে। আমার কিন্তু কখনও মনে হয়নি যে, মারাদোনা একজন উদ্ধত, দুর্বিনীত ব্যক্তি— বরং মনে হয়েছে যে, মারাদোনা এমন একজন মানুষ যাঁকে প্রতিনিয়ত ভুল বোঝা হয়।

মারাদোনার থেকেও ইমেজে যিনি বড়, সেই পেলের ঘরের সাতটি ঘর পরে তে-রাত্রি কাটিয়েছিলাম আমার সংবাদিকতার জীবনের প্রত্যুষে। ওবেরয় গ্র্যান্ড। পেলে এসেছিলেন কলকাতায়। 'যুগান্তর' আমাকে, বিশিষ্ট চিত্র সাংবাদিক সুনীল দত্তকে এবং লেখক জ্যোতির্ময় দত্তকে গ্র্যান্ডে ঘরভাড়া করে রেখেছিল টাটকা খবর পরিবেশনের জন্য। পেলেকে দেখেছিলাম তখন অন্য রূপে। এক রাতে মোহনবাগানের দেওয়া নৈশভোজের আসর থেকে পেলে বেরিয়ে গেলেন কয়েক মিনিটেই। জিজ্ঞাসা করলাম,— 'আপনার জন্য নৈশভোজ। আপনি চলে যাচ্ছেন এত তাড়াতাড়ি'?

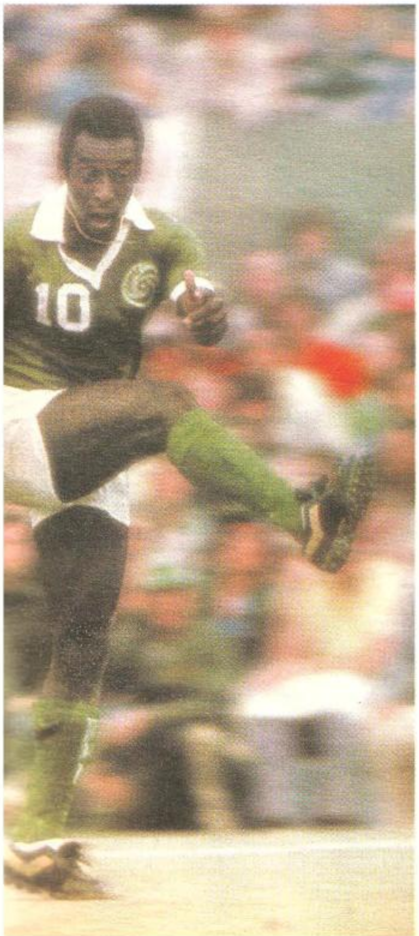

পেলে জবাব দিলেন— 'আমি পেলে। আমাকে রোল মডেল করে বহু খেলোয়াড় এগোতে চায়। তারা যদি দেখে যে, পেলে নৈশভোজের আসরে রাত জাগছে তাহলে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে। ওরা ভাববে রাত জেগেও ভাল খেলা যায়। আমি সেই ধারণায় বিশ্বাস করি না। তাই দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য আমি কখনই কোনও নৈশভোজে বেশিক্ষণ থাকি না।'

এই হলেন পেলে। এক এবং অদ্বিতীয়। এরপর বিদেশে বহু বার পেলের মুখোমুখি হয়েছি। ইতালিতে, ফ্রান্সে, জাপানে; দেখেছি যে, তিনি কখনও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

যেমন আর এক ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকারকেও বিভিন্ন সময়ে দেখেছি আপোষহীন মানসিকতায়। গাভাসকার হলেন ভারতীয় ক্রিকেটে আধুনিকতার প্রথম ধ্বজাবাহী সৈনিক। গাভাসকর মানেই লড়াই, গাভাসকার মানেই জীবনের স্পন্দন। গাভাসকার এখনও সেইরকমই।

স্বপ্ন আঁকল ইস্টবেঙ্গল

বল বয়

'মাছের রাজা ইলিশ
আর খেলাতে ফুটবল
সেই খেলাতে সেরা দল
আমার ইস্টবেঙ্গল রে
আমার ইস্টবেঙ্গল...'

বাংলা ব্যান্ডের গানের সঙ্গে নাচছে বিভিন্ন বয়সের ছেলে-মেয়েরা, উড়ছে লাল-হলুদ আবির, মশালের আলোয় চকচক করছে মুখগুলো, জয়ের আনন্দের প্রতিফলন সেখানে।

বাংলার ফুটবলে এই দৃশ্য কি খুব পরিচিত? না, আদৌ নয়। ফুটবল নিয়ে বাঙালির উন্মাদনা শেষ(?) হয়ে গেছে গত শতকের আশির দশকের প্রথমেই, আমাদের ফুটবলপ্রেম জেগে ওঠে প্রতি চার বছরে একবার— ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা-ইতালি'র বিশ্বখেতাবী লড়াইএর সময়। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-এর খেলার টিকিটের জন্য একসময় চব্বিশ ঘণ্টা আগে থেকেই লাইনে দাড়াতে হত। পাড়ায় পাড়ায় ইস্ট-মোহন নিয়ে রেষারেষি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অজয়-পুস্পেনদের কল্যাণে ইস্ট-মোহন বাড়ির হেঁসেল অবধি পৌঁছে গেছিল। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ছিল বাঙালির বড়ই আদরের। কিন্তু গত দুই দশকে এই উন্মাদনা ফিকে হয়ে এসেছে অনেকটাই। আজকের প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের রক্তে লাল হলুদ বা সবুজ মেরুন কি আদৌ দোলা দেয়?

এই পটভূমিতে ওপরে বর্ণিত দৃশ্যটি খুব অপ্রত্যাশিত নয় কি? এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল

ইস্টবেঙ্গল জাতীয় ফুটবল লিগ জয় করার পরে। ইস্টবেঙ্গল আগেও একবার জাতীয় লিগ জিতেছে, মোহনবাগানও তিন তিন বার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে, কিন্তু জয়ের রেশ থেকেছে একদিন, বড়জোর দুদিন। এ বছরের মতো দিনের পর দিন উৎসব? না, কলকাতার ফুটবলের স্বর্ণযুগেও উচ্ছাসের এতোটা বাড়াবাড়ি ছিল না। একটি ফুটবল দলকে নিয়ে গান বাঁধা হচ্ছে, সমবেত জনতা এক সঙ্গে সেই গানে গলা মেলাচ্ছে— এমন দৃশ্য তো ইউরোপের মাঠে ময়দানে দেখা যায়। কলকাতার ফুটবল মানচিত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নতুন।

জাতীয় লিগ জেতার রেশ কাটতে না কাটতেই ইস্টবেঙ্গল পেল আর এক আন্তর্জাতিক সাফল্য। জাকার্তার মাটিতে ইস্টবেঙ্গল জিতে নিল আশিয়ান কাপ।

ইস্টবেঙ্গলের মুকুটে আরও একটি পালক যোগ হল। শতাব্দী ছুঁইছুঁই প্রাচীন এই ক্লাবটি ভারতীয় ফুটবলে অসংখ্য নজির গড়েছে। ক্লাবের এই সাম্প্রতিকতম সাফল্যের আলোচনার আগে একবার পেছন ফিরে দেখা যাক।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্ম ১৯২০ সালে। কলকাতা ময়দানের বেশ কিছু ক্লাবের থেকে বয়সে অনেকটাই নবীন এই ক্লাব। বাঙালিরা ফুটবল খেলতে শুরু করে উনবিংশ শতকের শেষ অর্ধে। ভারতবর্ষ সেই সময় ইংরেজদের অধীনে। ইংরেজরাই ফুটবলকে নিয়ে এসেছিল এই দেশে। ভারতের মাটিতে ফুটবলের প্রথম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় অবশ্য মুম্বইতে। ১৮০২ সালে সেনা বিভাগের দুটি দলের মধ্যে ঐ খেলা হয়। ভারতীয় ফুটবলের জনক অবশ্য এই বাংলার। কিশোর নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সৌভাগ্য হয়েছিল প্রথম ভারতীয় হিসেবে ফুটবল স্পর্শ করার। এই নগেন্দ্রপ্রসাদের উৎসাহেই তার বন্ধুরা দল বেধে ফুটবল খেলতে শুরু করে। পরবর্তী কালে নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীই হয়ে ওঠেন বাংলা ফুটবলের অন্যতম সংগঠক। দুজন ব্রিটিশ অধ্যাপকও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। সূচনা হয় বাঙালি ক্লাবগুলির। প্রথমদিকে বাঙালি ক্লাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শোভাবাজার, কুমারটুলি ক্লাব। ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মোহনবাগান, ১৮৯০ সালে এরিয়ান্স এবং ১৮৯২ সালে মহামেডান স্পোর্টিং। ১৮৯৩ সালে তৈরি হয় ইন্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন। ১৮৯৮ সালে আই. এফ. এ. শুরু করে কলকাতার ফুটবল লিগ।

একের পর এক বাঙালি ক্লাব তৈরি হওয়া শুরু হল। কলকাতা ফুটবলে সেই সময় ইংরেজ দলগুলিরই আধিপত্য। বাঙালি দলগুলিও সমান তালে ওদের সঙ্গে লড়াই করত। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে পার্থক্য গড়ে উঠতো ইংরেজদের বুট পরা পায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের খালি পায়ের লড়াইএর জন্য। ১৮৯২ সালে 'ট্রেডস কাপ' জিতে নিল শোভাবাজার ক্লাব। আর ভারতীয় ফুটবলে যুগান্তকারী ঘটনাটি ঘটল ১৯১১ সালে। সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা আই, এফ, এ শিল্ড ফাইনালে ইস্টইয়র্ক কে ২-১ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান হল মোহনবাগান।

মোহনবাগান যখন বাঙালিদের নয়নের মণি, সেই সময় কলকাতার ফুটবল আঙিনায় প্রবেশ ইস্টবেঙ্গলের। মূলত, টাঙাইল (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) এর জমিদার সুরেশচন্দ্র চৌধুরির উদ্যোগেই তৈরি হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, সুরেশচন্দ্র চৌধুরির পাশে

ছিলেন তড়িৎভূষণ রায় এবং বাংলার ক্রিকেটের জনক সারদারঞ্জন রায়। সারদারঞ্জনই হলেন ক্লাবের প্রথম সভাপতি।

১৯২১-এ ইস্টবেঙ্গলকে সুযোগ দেওয়া হল কলকাতা লিগের দ্বিতীয় বিভাগে। ১৯২৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগে লিগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে প্রথম বিভাগে খেলার অধিকার অর্জন করে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম বছরেই দুরন্ত ফুটবল উপহার দেয় ক্লাব। লীগ তালিকায় যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান পায় ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু ২৮শে মে মোহনবাগানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই বিজয়ী হয় ইস্টবেঙ্গল। শুরু হল এক দীর্ঘকালীন লড়াই। বাঙালি ভাগ হয়ে গেল দুই শিবিরে। কিন্তু বছর চারেক পরেই ছন্দপতন, ১৯২৮ সালে লিগে সর্বনিম্ন স্থান পেয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে গেল ইস্টবেঙ্গল। তিন বছর তাদের খেলতে হল দ্বিতীয় বিভাগে। ১৯৩১-এ দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়ে আবার প্রথম বিভাগে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল।

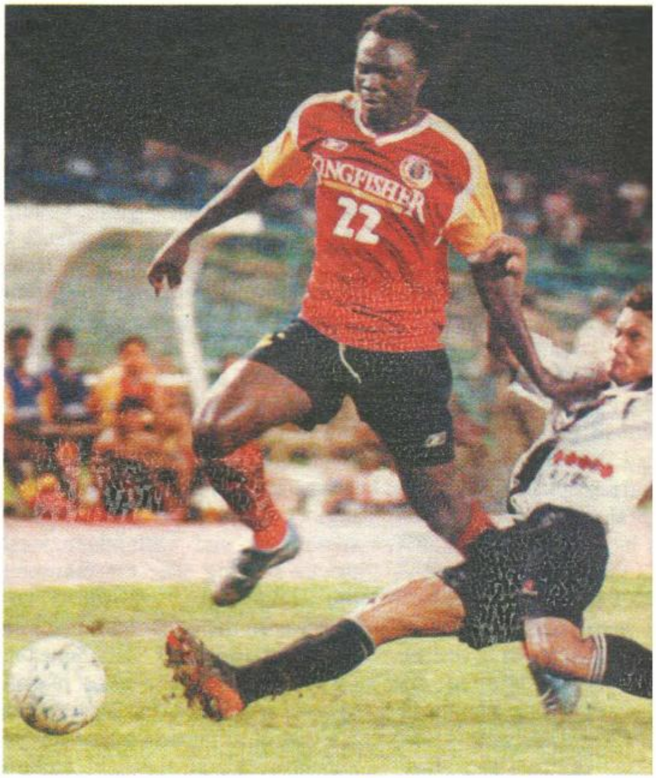

১৯৩২ এ প্রথম বিভাগে উঠেই প্রায় চ্যাম্পিয়ান হয়ে যাচ্ছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু শেষ দিকে পর পর কয়েকটা খেলায় পরাজিত হয়ে মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাদের। কিন্তু আর তাদের পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এর পরে সাতটি দশক কেটে গেছে। ভারতীয় ফুটবলে স্থায়ী আসন পেয়ে গেছে ইস্টবেঙ্গল।

১৯৪২-এ কলকাতার প্রথম বিভাগের লিগে প্রথম সাফল্য এল ইস্টবেঙ্গলের শিবিরে। ১৯৪৬-এ প্রথমবার চ্যাম্পিয়ান হয় আই.এফ.এ শিল্ডে। রোভার্স কাপ, ডুরান্ড কাপ এবং ডি.সি.এম ট্রফি প্রথমবার ইস্টবেঙ্গল শিবিরে আসে যথাক্রমে ১৯৪৯, ১৯৫১ ও ১৯৫০ সালে। প্রথম ফেডারেশন কাপ এককভাবে চ্যাম্পিয়ান হয় ইস্টবেঙ্গল ১৯৮৫ সালে এবং প্রথম জাতীয় লিগ ঘরে তোলে ২০০০-২০০১ সালে। লীগ, শিল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স ইত্যাদি ট্রফিগুলি অসংখ্যবার এসেছে ইস্টবেঙ্গলের ঘরে।

১৯৪৮ সালে চিনের অলিম্পিক দলের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয়লাভ করে ইস্টবেঙ্গল। তারপর থেকেই বিদেশি দলগুলির বিরুদ্ধে ভালো খেলার সুনাম গড়ে ওঠে ইস্টবেঙ্গলের। বেশ কিছু শক্তিশালী বিদেশি দলকে বিভিন্ন সময়ে পরাজিত করেছে ইস্টবেঙ্গল। ১৯৫১ সালে সুইডেনের গোটেবর্গ, ১৯৭০ সালে শীল্ড ফাইনালে ইরানের পাস ক্লাব, ১৯৭৩ সালে কোরিয়ার পিয়ং ইয়াং সিটি ক্লাব ইত্যাদি ক্লাবগুলি ইস্টবেঙ্গলের লড়াকু মনোভাবের বিরুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল।

৭০'এর দশকটি ইস্টবেঙ্গলের স্বর্ণযুগ। পরপর ছ-বার লীগ জয়, ৭২ এ ত্রিমুকুট (শিল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স), সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি প্রতিযোগিতাকে জয়, চির-প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে ৫-০ গোলে পরাজয়— ইত্যাদি অসংখ্য কৃতিত্বের নজির সৃষ্টি করে ক্লাব এই দশকে। ১৯৯০-তে ক্লাব দ্বিতীয়বার ত্রিমুকুট জয় করে।

আজকাল কলকাতা তথা ভারতের সব দলেই বিদেশি খেলোয়াড়ের দাপট। ৪০-এর দশকেই লাল হলুদ জার্সি শরীরে চাপান এক বিদেশি— পাগ্‌সলে। ১৯৪৫ সালে তিনি কলকাতা লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাও হন। লিগে সর্বোচ্চ স্কোরারের সম্মানও এক ইস্টবেঙ্গলীর। নায়ারের করা ৩৫টি গোলের রেকর্ড আজোও ভাঙেনি। আর বিদেশিদের মধ্যে ৮০-এর দশকে খুব অল্প সময়ের জন্য খেলে যাওয়া শিল্পী মজিদ বাসকারকে ভুলতে পারে না কোনও ইস্টবেঙ্গল সমর্থকই।

ফোটো : শান্তি সেন ও ইন্টারনেট

বানররাও এখন ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ দিচ্ছে

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

'গুড মর্নিং মিস্টার শেইখাও। সব খবর ভালো তো?' ভোরবেলায় চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিতে না দিতেই ফোনটা এল।

ফোনটা করেছেন মিঃ থুয়ান। যিনি ব্যাঙ্ককের একজন অতি ধনী নারকেল ব্যবসায়ী। তাঁর বহু একর নারকেল বাগানে ঢোকা এক স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা। সমুদ্রের অগাধ নীল জল আর সোনালি বেলাভূমি প্রায় ঘেঁষেই তাঁর নারকেল 'কুঞ্জ'। 'কুঞ্জ' নাকি গহীন অরণ্য। গ্রীষ্মের প্রখর তাপ সে অরণ্যে তেমন জোরদার হতে পারে না। অজস্র নারকেল গাছের পাতা ছাতা হয়ে সে তাপকে প্রতিহত করে। ঘোর বর্ষায় আবার বদলে যায় ছবি। খুব ঝড় বাদলের দিনে যখন সব নারকেল গাছ খুশিয়াল হয়ে কোরাস গান গায় তখন মনে হয় এমনই বুঝি অরণ্যের ভাষা। তবে থুয়ান নিজেই বলেন, তাঁর বাগানে স্বর্গের পরীরা নেমে এসে নাকি ঘুরে বেড়ায় চাঁদনি রাতে । হাজার হাজার ঝিরিঝিরি নারকেল পাতার ফাঁকফোর দিয়ে জ্যোৎস্না কী যে অপরূপ আলপনা আঁকতে থাকে, তা যে দেখেছে সেই শুধু জানে।

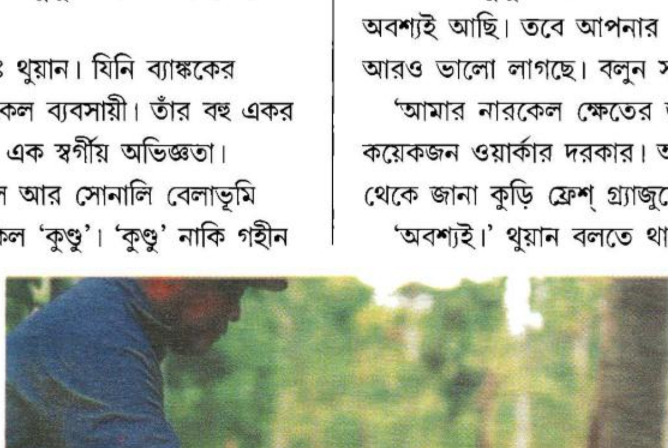

থুয়ানের ফোন পেয়ে এসব ছবিই খুব দ্রুত ঘুরে গেল সমফন শেইকাও-এর মনে। চায়ের পেয়ালায় একটি লম্বা চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, 'ভালো তো অবশ্যই আছি। তবে আপনার ফোন পেয়ে মনটা আরও ভালো লাগছে। বলুন স্যার, কী করতে পারি।

'আমার নারকেল ক্ষেতের জন্য ইমিডিয়েটলি কয়েকজন ওয়ার্কার দরকার। আপনার ইনস্টিটিউট থেকে জানা কুড়ি ফ্রেশ্ গ্র্যাজুয়েট পাওয়া যাবে?'

'অবশ্যই।' থুয়ান বলতে থাকেন, 'পরশুই তো ছাত্রদের ক্যাম্পাস ইনটারভিউ। আপনিও আসুন না কেন এখানে। ওয়ার্কারদের নিজেই পছন্দ করে নিয়ে যাবেন।'

'ওক্কে। তাই আসছি। একটা কথা মিঃ থুয়ান। এখান থেকে ওদের নিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকটা খাঁচা কিন্তু আপনার লাগবে। যদি নিয়ে আসেন সঙ্গে করে ভালো হয়। কেননা খাঁচার সাপ্লাইটা ইদানিং একটু ইরেগুলার হয়ে পড়ছে।'

গম্‌গমে স্বরে হেসে উঠলেন থুয়ান। 'হাসালেন মশাই। আপনার প্রতিটি ছাত্র এতই আজ্ঞাবহ আর বুদ্ধিমান যে মাঝে মাঝে মনে হয় বানরের ছদ্মবেশে

ওরা বুঝি মানুষ।'

কথাগুলো শুনে গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে সমফনের। তাকে এখন বিশ্বে সকলেই এক ডাকে চেনে। তার এই সব ছাত্ররাই এখন তাঁর জীবন্ত বিজ্ঞাপন।

ওর ছাত্ররা গোটা দিন কাজ করে মুখটি বুজে। ওদের জন্যই দক্ষিণ থাইল্যান্ডের নারকেল শিল্প বেঁচে আছে। বিদেশি মুদ্রা আয় ভালই হয় বলে দেশের সরকারও এই সব ব্যবসায়ীদের নানা সাহায্য করে। তাই বলে থুয়ানের ছাত্ররা কাজকর্ম থামিয়ে যে ধর্মঘট করে তা কিন্তু মোটেই নয়। এমন কি কাজের বিনিময়ে নগদ নারায়নেরও কোনও ব্যাপার এদের নেই। শুধু ক্ষিদে পেলে বেশ কিছু কলা পেলেই ওরা খুশি। আর মালিক খুশি হয়ে যদি আখরোট, কিসমিস কিংবা বাদাম-টাদাম দেন তবে ওরা আনন্দে তুমুল লাফালাফি করে।

হ্যাঁ বানরদের জন্য ট্রেইনির কলেজ পৃথিবীতে এই একটিই রয়েছে। এটি দক্ষিণ থাইল্যান্ডের সুরাথনি জেলায়। এই জেলারই মানুষ হলেন সমফন। বানরদের বিদ্যুৎ গতিতে গাছে ওঠা নামা দেখতে দেখতেই ওঁর হঠাৎই মাথায় এসেছিল আইডিয়াটা। যদিও ও দেশে বানরদের এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই ১৮০০ সাল থেকেই। সমফনের দেখাদেখি ওদেশে অনেকেই এখন এই "মর্কট-কর্মী" তৈরিতে উৎসাহী। তবে রীতিমতো মাংকি ট্রেনিং কলেজ নাম দিয়ে ওদের প্রশিক্ষণাগার চালানোর কৃতিত্ব ঐ সমফেনেরই। ওঁর কলেজের ভেতর রয়েছে বিশাল সবুজ মাঠ আর উঁচু উঁচু নারকেল গাছ। ঐ গাছগুলিই হল বানরদের ক্লাসরুম। ঐ গাছেই তাদের শিক্ষাগ্রহণ, ওখানে তাদের পরীক্ষার সেন্টার এবং চাকরির ইন্টারভিউ।

একদিন কাগজ পড়ছিলেন সমফন। ছোট্ট একটা পরিসংখ্যান ওকে এই অভিনব কলেজ খোলার চিন্তাটাকে জোরদার করে। পরিসংখ্যাটি ছিল নারকেল সংক্রান্ত। ওদেশের ষাট লক্ষ মানুষ প্রতিদিন নারকেল খায়। ঐ চাহিদা মিটিয়েও থাইল্যান্ড বহু লক্ষ ডালার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। সমফন তখুনি ভেবেছিলেন এক একটি নারকেলগাছ ১৫ মিটার লম্বা। সেই গাছে চড়ে পাকা নারকেল পাড়িয়ের সংখ্যা ক্রমশই বিরল হচ্ছে। এ অবস্থায় মানুষের পূর্বপুরুষদের সাহায্য নিলে কেমন হয়? এরপর কয়েকটি বানর সংগ্রহ করে এনে নিজেই চালু করে দিয়েছিলেন ওদের ট্রেনিং কলেজ।

বানরকে কোনও কাজ শেখানো খুব সহজ নয়। এক একটি কাজ আয়ত্ত করতে ওদের বেশ ভালোই সময় লাগে। সমফন এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে নির্ভেজাল বোকা এবং অসীম ধৈর্যশালী লোক

বাঁ দু রে বু দ্ধি

বাঁদরের বুদ্ধি নিয়ে অনেক কথা আছে। আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরো-বায়োলজিস্ট মিগুয়েল নিকোলেনিস এ নিয়ে গবেষণা করছেন। বছর তিনেক আগে তিনি একটি দক্ষিণ আমেরিকার ডুরুকুলি (বা আউল মাংকি) বাঁদরের (পাশের ছবি) মাথায় ইলেকট্রোড বসিয়ে তার ব্রেন সিগ্‌ন্যালের সাহায্যে একটা রোবটিক হাত চালনা করতে শিখিয়েছিলেন। এখন দুটো বাঁদরকে ওইভাবেই কম্পিউটার গেম খেলতে শিখিয়েছেন— হাত পা না নাড়িয়ে কেবল ব্রেন সিগ্‌ন্যাল দিয়ে তারা 'কম্পিউটার গেম' খেলছে। তোমরা পারো? এ দুটোই ভারতের মর্কট— নাম অরোরা আর আইভি। বাঁদুরে বুদ্ধি আর কাকে বলে?

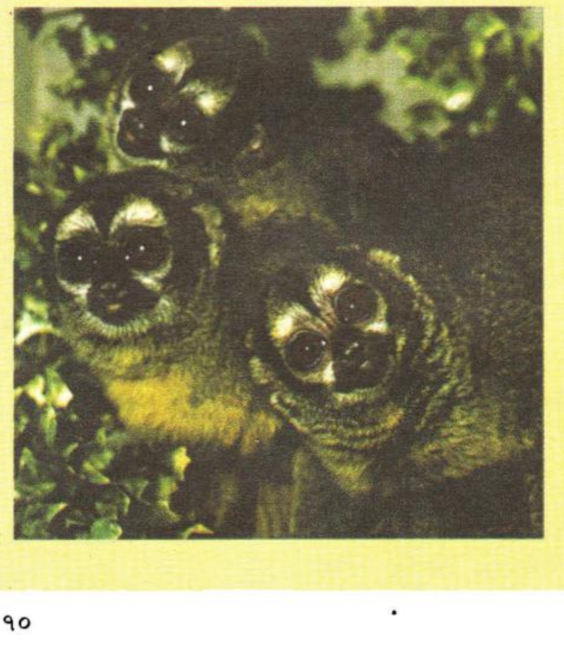

ছাড়া ওদের মাষ্টার হওয়া অসম্ভব। হ্যাঁ সেই অর্থে আমিও বোকা। কেননা ভগবান বোকাদের ধৈর্য শক্তি একটু বেশি করে দেন। তা ছাড়া ওরা মহাকাশে গিয়ে রকেট চালিয়েছে, কাজেই চেষ্টা করলে গাছে ওঠে নারকেল পাড়তে পারবে না? এই বিশ্বাসের জোরেই এ কাজে নামি আমি।

আগে নিজে বানর জোগাড় করে ওদের ট্রেনিং দিয়ে কাজ শিখিয়ে নারকেল বাগিচার মালিকদের কাছে বিক্রি করতেন। এখন বাগিচার মালিকেরা বানর নিয়ে তাঁর কলেজে ভরতি করে যায়। তার ঠিক ছয় মাস পর ওরা এখান থেকে নিয়ে যান নারকেল পাড়া কর্মীদের, যারা সারা জীবন বিনা পরিশ্রমিকে কাজ করে যাবে।

কেমন ছাত্র পছন্দ ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যালের? হাঁ। তাও জানিয়েছেন বৈকি তিনি। তার অভিজ্ঞতায় অল্পবয়সীরাই চট্‌পট্ শিখে নেয়। স্ত্রী এবং পুরুষ সব লিঙ্গের বানরই এ কাজ করতে সক্ষম। তবে ঠিক মানুষেরই মতো পুরুষ বানরই বেশি শক্তি ধরে তাই বেশিক্ষন কাজ করতেও সক্ষম হয়। ওরা ঠিক পাঁচ বছর বয়সে কাজ শুরু করে এবং দশ বছর কি তার চেয়ে কিছু কম-বেশি সময় ওরা এই কাজ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা দরকার ওদের গড় আয়ু হল পঁচিশ বছর।

হ্যাঁ পরীক্ষা তো অবশ্যই নিই। জানাচ্ছেন শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়। যদিও কোনও রিপোর্ট কার্ড নেই তবুও পাশ-ফেলের ব্যাপারটার দিকে নজর দিই। জেনে সুখী হবেন, পরীক্ষায় শতকরা নব্বই জন ছাত্রই ভালোভাবে পাশ করে তারপর বুক চিতিয়ে চাকরি করতে যায়।

ওদের ব্যবহার কেমন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন ওরা বেশ সভ্যই। আমার সামনে ওরা খুব সিরিয়াস। তবে খাবার সময় মাঝেমধ্যে ওরা ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে মেতে ওঠে। পুরুষে পুরুষে নয়, একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ বানরের মধ্যেই লড়াই খুব তীব্র আকার ধারণ করে।

ওদের সিলেবাসটা কেমন? জানতে চেয়েছিলেন এক সাংবাদিক।

সিলেবাসের প্রথম পাঠই হল ভয় ভাঙানো। ওরা অচেনা পরিবেশে অচেনা মানুষ দেখলে ঠিক শিশুর মতোই ভয় পেয়ে দৌড়ে পালাতে চায়। প্রথম প্রথম বেশ কয়েক দিন আমি ঘন্টার পর ঘন্টা ওদের

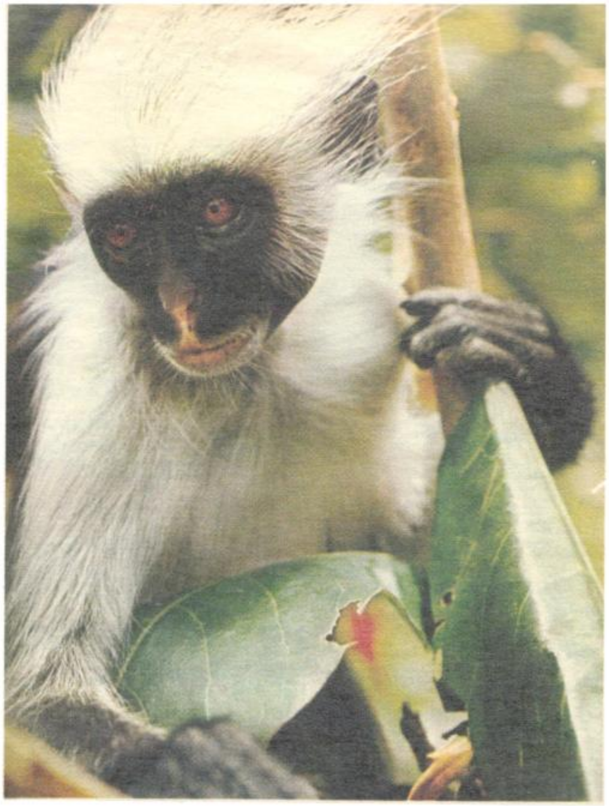

সামনে ক্লাসরুমের মেঝেতে বসে থাকি। আমার হাতে থাকে একটি শুকনো নারকেল। বারে বারে ঐ নারকেলটিকে আমি ঘুরিয়ে যাই। ওরা দেখুক কি না দেখুক তা আমি ভাবি না।

তারপর?

ক'দিন পর আমি আর একটু ওদের দিকে এগিয়ে বসি। এবং আমার হাতে ঐ নারকেল ঘুরতেই থাকে। আর মুখে বলতে থাকি লক্ষ্মী ছেলে। সোনা ছেলে। (পড়ো লক্ষ্মী বাঁদর, সোনা বাঁদর)।

এর কয়েকদিন পর ওদের দিকে হাত বাড়াই। আমার কোলে বসিয়ে ভালো ভালো কথা বলি আর আদর করি। এতে ভাব জমে ওদের সঙ্গে। কথা ও আদরের সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে নারকেল কিন্তু ঘুরতেই থাকে।

পরের কোর্স হলো ওদের হাত এবং পায়ের চেটো বসিয়ে দিই ঐ ঘুরন্ত নারকেলের ওপর। ক'দিন পর ওরা কোথাও নারকেল পড়ে থাকতে দেখলেই নিজেরা গিয়ে নারকেলটি ঘোরাতে থাকে।

'আচ্ছা নারকেলটা ঘোরানো কেন হয়, তা কিন্তু আমরা এখনও জানি না।' বলেছিলেন সাংবাদিকটি।

আসলে ঐ ভাবেই গাছে থেকে ওদের নারকেল ছিঁড়তে হয় কিনা। ওরা তো আর কাটারি দিয়ে ডাবের কাঁদি কাটতে পারবে না। একটি নারকেলকে (ঝুনো ডাব) বোঁটা সমেত বারে বারে ঘোরালেই

সেটি বৃন্তচ্যুত হয়।

'আচ্ছা ওরা কি দীর্ঘক্ষণ মন দিয়ে এসব লক্ষ করে আপনার ক্লাসে?' ক্যামেরা ঘাড়ে এক চিত্র সাংবাদিক পাঠরত ছাত্রদের ছবি তুলতে তুলতে জানতে চাইলেন।

না-না। মোটেই না। ওদের একাগ্রতা বড়ই কম। সারাদিনে পনেরো মিনিটই যথেষ্ট। এর পরের পাঠক্রম ওদের ওপর দিকে লক্ষ্য করতে শেখানো এবং পেছনের পায়ের ব্যবহার। তাই শুকনো নারকেল বোঁটা সমেত একটু ওপরে বেঁধে ওদের উৎসাহ দেওয়া হয় যাতে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওরা নারকেলটি ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে বৃন্তচ্যুত করতে শেখে।

এরপর ওদের নিয়ে আশা হয় আসল নারকেল গাছের সামনে। ১৫ মিটার উঁচু একটি

নারকেলগাছের প্রথমে ৩ মিটার উঁচুতে কয়েকটি নারকেল বেঁধে দেওয়া হয়। এর পর ক্রমশ উচ্চতা বাড়াতে বাড়াতে ওদের পৌঁছে দেওয়া হয় একেবারে আসল লক্ষ্যে। ওরা সত্যিই প্রথম যেদিন গাছ থেকে নারকেল ছিঁড়ে নীচে ফেলতে থাকে সেদিন ওদের জন্য বরাদ্দ থাকে কাজু আর কিস্‌মিস্।

এবার দেখা যাক ওদের ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ কিভাবে হয়। সমফন ওর ছাত্রদের নিয়ে আসেন তাঁর নিজস্ব নারকেল কুঞ্জে। তারপর একজন বানরকে গাছের নীচে নিয়ে গিয়ে উনি আদেশ দেন, "খুন" "খুন'। থাই ভাষায় "খুন" শব্দটির মানে হল ওপর। বানরটি ওপরে উঠতে শুরু করলেই উনি বলতে থাকে "অ" "অ"। "অ" কথাটির অর্থ হল মোচড়ান। একথাটি শুনেই বানরটি নারকেল ধরে মোচড়াতে থাকে। তারপর বোঁটা খসলেই নারকেলটি সে নীচে ফেলে দেয়। এই সময় সমফনকে বলতেই হবে আঃ দি - আঃ দি"। অর্থাৎ ভালো ভালো বানর-ভালো বানর) কাজ শেষ হতেই উনি চেঁচিয়ে বলেন লং অর্থাৎ নীচে নামো।

বানরগুলি সকলেই যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে যার কর্মক্ষেত্রে দিকে যাত্রা করে তখন সমফন বড়ই বিষন্ন বোধ করেন। কেননা প্রতিটি ছাত্রকে উনি আপন সন্তানের মতোই ভালোবাসেন। আর ভালোবাসেন বলেই ওদের তিনি এমন ভাবে টেনিং দেন, যাতে কাজে ভুলচুক করে মার কিংবা বকুনি খেতে না হয়।

সমফন বলেন, বানরদের দিয়ে তিনি নানা রকম কাজ করাতে পারেন। ওর একশো রকম আদেশ পালন করার মতো বানরও তার তৈরি আছে। একটি বানরকে কর্মী করার খরচ ২৮০ মার্কিন ডলার। কাজের সময় ওদের প্রতি জনের জন্য খরচ হয় এক ডলারের অর্ধেকের কম। অথচ ওরা এক এক জনে প্রতি বছর চল্লিশ হাজার ডলার আয় করতে সাহায্য করে।

ছাত্রদের জন্যই তিনি একজন বিখ্যাত মানুষ। পৃথিবীর বহু টেলিভিশানে কোম্পানি তাঁকে আমন্ত্রন জানায়। তাঁর ছাত্রদের নিয়ে টিভি স্টুডিওতে হাজির হওয়ার জন্য। "ন্যাশান্যাল জিওগ্রাফিক", "অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট" এবং 'ডিসকভারি চ্যানেলের আমন্ত্রনও তাঁর কাছে এসেছে বহুবার। কিন্তু প্রতিবারেই তিনি তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, আমার মন পড়ে থাকে আমার নারকেল বাগান আর আমার পরিবারের ওপর। এই নিয়েই বেশ আছি আমি। আমার ছাত্রদের সঙ্গ আমাকে স্বর্গ সুখ দেয়। ওদের ছেড়ে দূরদূরান্তের টিভি চ্যানেল? রামোঃ।

ফোটো : ইন্টারনেট

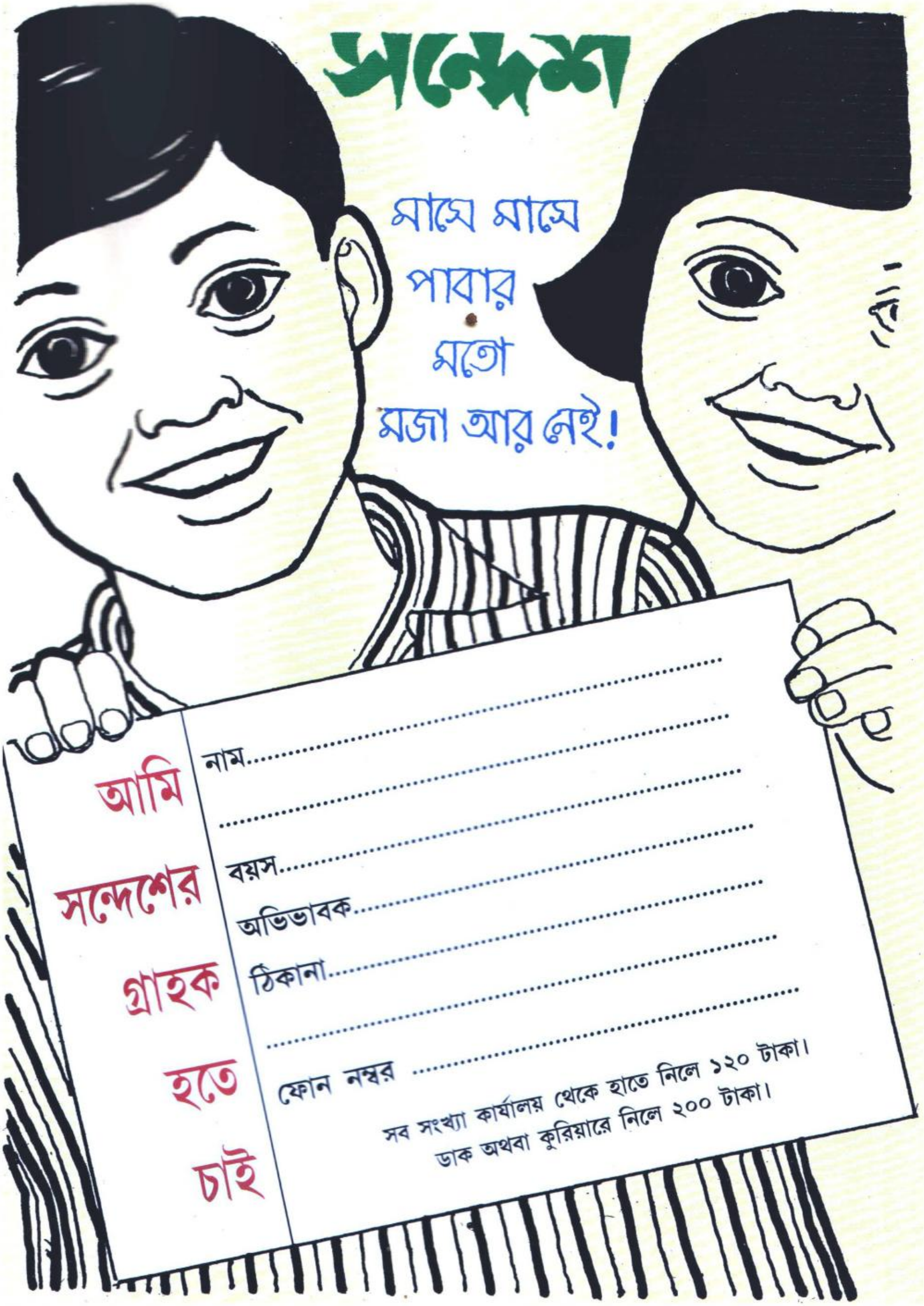

সন্দেশ
মাঝে মাঝে পাবার মতো মজা আর নেই!
আমি সন্দেশের গ্রাহক হতে চাই
নাম
বয়স
অভিভাবক
ঠিকানা
ফোন নম্বর
সব সংখ্যা কার্যালয় থেকে হাতে নিলে ১২০ টাকা।
ডাক অথবা কুরিয়ারে নিলে ২০০ টাকা।

Regd. NO. WB/SC–102 R.N.I. No. 12007/64 Sandesh November 2003 **Rs. 12**

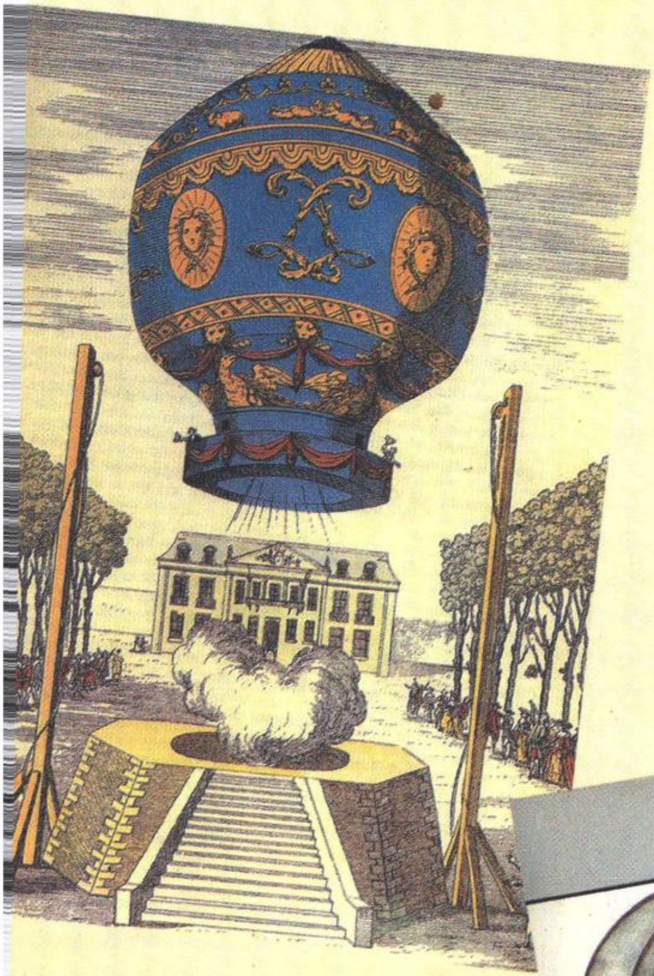

পরের সংখ্যার আকর্ষণ

আকাশে ওড়ার একশো বছর

ধারাবাহিক চিত্রনাট্য

জয়বাবা ফেলুনাথ

উপন্যাস : যমুনাবতী

গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-কমিক্স

আর সমস্ত নিয়মিত বিভাগ